Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও লৌকিক শব্দকোষ

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.1
Pages	9-53
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও লৌকিক শব্দকোষ

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাম্‌ (১৭৪৩) রচিত বাংলা অভিধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন অভিধানে, শব্দকোষে বা শব্দ-সংকলনে আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহের বিভিন্ন উদ্যোগ দীর্ঘকাল ধরে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদেশী প্রাচ্যবিদ্‌দের মধ্যে কেরী, লিডেন, গ্রিয়ারসন প্রমুখ আঞ্চলিক-শব্দ সংগ্রহে বা ভাষাজরিপে বিশেষ উৎসাহিত হন। পারজিটর সাহেব আঞ্চলিক শব্দের একটি অভিধান গ্রন্থও সংকলন করেন। সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে একমাত্র ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* ও কামিনী কুমার রায় সম্পাদিত *লৌকিক শব্দকোষ* প্রণীত হয়। পদ্ধতিগত কারণে উভয় গ্রন্থে কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা বর্তমান। উভয় গ্রন্থেই কিছু অসম্পূর্ণতা থাকার কারণে একটি গ্রন্থ অপরটির পরিপূরক বলা চলে। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করার জন্য নির্ধারিত শব্দতালিকার সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শব্দ সংগ্রহ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

॥ এক ॥ পূর্বকথা

সংস্কৃত ভাষায় একটি কথা রয়েছে— 'যোজনান্তে ভাষা', অর্থাৎ যোজন-ব্যবধানেই পৃথক ভাষা। বাংলাদেশে যোজন ব্যবধানে পৃথক ভাষার সন্ধান পাওয়া না গেলেও জেলা বা অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সে কারণেই ভাষাতত্ত্ববিদগণ বহুকাল ধরে এদেশের উপভাষার উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এসেছেন। বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে দুটি অসাধারণ কাজ হয়েছে— ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১৯৬৫-১৯৬৮), এবং কামিনীকুমার রায় সম্পাদিত *লৌকিক শব্দকোষ* (১৯৬৮-১৯৭১)। এ দুটি শব্দকোষ বিষয়ে আলোচনার আগে বাংলার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের বিভিন্ন প্রয়াস সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা দরকার।

একথা সত্য যে, ইউরোপীয়রাই বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনায় প্রথম উদ্যোগী হন। এ ব্যাপারে পর্তুগিজদের কথাই প্রথম বলতে হয়। ১৪৯৭ সালে পর্তুগিজ ভূ-পরিব্রাজক ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন। এ-আগমন ছিল প্রধানত বাণিজ্য-ব্যপদেশে। পরে, ষোল শতকে পর্তুগিজ জেসুইট (Jesuit) সম্প্রদায়ের মিশনারিরা এই উপমহাদেশে আসেন এবং তাঁরা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ধর্মপ্রচার কার্যে তৎপর হন। এ সময় বাংলা মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন ফাদার মার্কস আন্তনিও সাঁতুচি। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী ধর্ম-প্রচারের সুবিধার্থে, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধর্মপুস্তক, ব্যাকরণ এবং অভিধান সংকলন করেন। তাঁদের সংকলিত, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে, বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠারও আগে, ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহরে রোমান হরফে ছাপা দুটি বাংলা বই প্রকাশিত হয়। বই দুটি হচ্ছে— ক. মানোএল দা আস্‌সুম্‌পসাম রচিত *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* এবং খ. মানোএল দা আস্‌সুম্‌পসাম রচিত *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেঙ্গলা এ পর্তুগুয়েজ* (Vocabulario em idioma E Portúguez) অর্থাৎ বাংলা ও পর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ।[১]

গবেষকগণ মনে করেন, ফাদার সাঁতুচি ও তাঁর সহকর্মিদের সংকলিত অভিধান, ব্যাকরণ ইত্যাদি অবলম্বনে পাদ্রি মানোএল এদুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি গ্রন্থ দুটির মূল রচয়িতা নন, সম্পাদক মাত্র [Khondkar 1976 : 172]।

পাদ্রি মানোএল-দা- আস্‌সুম্‌পসাম্ ১৭৩৩ থেকে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত বঙ্গদেশে অবস্থান করেন এবং তাঁর প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিল ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চল। *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* গ্রন্থের মূল রচয়িতা পাদ্রি মানোএল না হলেও এ গ্রন্থে ঢাকার

ভাওয়াল অঞ্চলের ভাষার বিশেষ প্রভাব বর্তমান। এ গ্রন্থের বাংলা সংস্করণে প্রবেশক শীর্ষক ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন— "পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষয়ে, পাদ্রি মানোএল-এর বাঙ্গলায় যে তখনকার দিনের ঢাকা-অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে— সে বিষয়ে সন্দেহ নাই" [সজনীকান্ত দাস ১৩৪৬ : ১২]।

মানোএল সম্পাদিত ভোকাবুলারিও বা পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০ + ৫৯২। প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ভূমিকা, পরবর্তী ১ থেকে ৪০ পৃষ্ঠা বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, ৪১ পৃষ্ঠা থেকে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা পর্তুগিজ শব্দকোষ এবং ৩০৭ থেকে ৫৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ। পরিশিষ্ট ৫৭১-৫৯২ পৃষ্ঠায় নামবাচক শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সপ্তগ্রহের নাম ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত বাংলা সংস্করণটি মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। এ গ্রন্থের ভূমিকায় সুনীতিকুমার বলেন—" এইরূপ শব্দ গ্রহণ করিয়াছি যাহা আমার অজ্ঞাত বা যাহার অর্থ আমরা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত জানি না" [সুনীতিকুমার ও প্রিয়রঞ্জন ১৯৩১ : ১৬-১৭]। অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে, ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দাবলিই প্রধানত এই বাংলা সংস্করণে স্থান পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে কিছু শব্দের উল্লেখ করা যায় (রোমান হরফে মুদ্রিত বাংলা শব্দের প্রতিবর্ণ এবং পর্তুগিজ শব্দের বাংলা শব্দার্থ বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত) :

Adar - আদার- Iscar do angol (ছিপে মাছ গাঁথা)।
Atoca i. Axombit- আতকা অর্থাৎ আচম্বিত - sobre falto।
Bari- বাড়ি- Acoites (আঘাত, লাঠির বাড়ি)।
Bangui- বাঙ্গী- Melao (ফুটী, তরমুজ)।
Boroi - বরই- macaa da terra (দেশজ ফল বিশেষ)।
Caoa - কাউয়া- Gralha (কাক)।
Coutor- কৌতর pomba - (পারাবৎ)।
Chattai - চাটাই -Esteira - (মাদুর)।
Chotra. Chorta - চোৎরা, চোরতা Ortiga erva - (বিছুটি)।
Dorma - দরমা -Esteira - (মাদুর)।
Dibia - ডিবিয়া -Boceta -(বাক্স, পেটিকা)।
Tatta - ঠাটা -Rayo -(বজ্র)।

একথা বলা অনাবশ্যক যে, এগ্রন্থে মানোএলের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা শব্দ সংকলন ও সে শব্দাবলির পর্তুগিজ শব্দার্থ প্রদান। কিন্তু যাঁরা তাঁকে শব্দসংগ্রহে

সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং তাঁদের অজান্তেই এ অভিধানে ভাওয়াল অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দাবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলা যায় যে, মানোএলের এ অভিধান সম্পূর্ণ না হলেও অংশত এটি প্রথম আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০) কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন কাগজপত্রে আমরা বাংলা-ফার্সি অভিধানের একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি লক্ষ করি।[২] অনুমান করা যায়, বাংলা ভাষা শেখার প্রয়োজনে হ্যালহেড তাঁর মুনশীকে একটি বাংলা অভিধান প্রণয়নের নির্দেশ দেন। সেকালে বিদেশীদের মধ্যে অনেকেই ভাষা শেখার জন্য এ জাতীয় অভিধান সংগ্রহ করতেন। হ্যালহেডের মুনশী প্রথমে বাংলা শব্দগুলি সংকলন করেন এবং পরে ফার্সিতে সেগুলোর অর্থ লিখে দেন। তিনি যথাযথ ফার্সি প্রতিশব্দ যেখানে পাননি সেখানে কোনও অর্থ লেখা হয়নি। প্রায় দু'হাজার শব্দ-সম্বলিত এই শব্দকোষটি মুনশী স্বাধীনভাবে প্রস্তুত করে হ্যালহেডকে প্রদান করেন। হ্যালহেডের সুবিধার্থেই শব্দার্থ ফার্সিতে লেখা হয়েছিল। কারণ, তিনি ফার্সি ভাষা জানতেন এবং কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফার্সি অনুবাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

হ্যালহেডের মুনশী ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর চারপাশের জগতে ব্যবহৃত শব্দাবলিই এই শব্দকোষে সংকলিত হয়েছে [ব্রিটিশ লাইব্রেরি পাণ্ডুলিপি Additional 5661 A]। অভিধানে সংকলিত অধিকাংশ শব্দই পূর্ববঙ্গে প্রচলিত দেশজ ও আঞ্চলিক শব্দ। আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত আরবি-ফার্সি ও হিন্দুস্তানি শব্দের সংখ্যাও কম নয়। নিম্নে এ শব্দকোষ থেকে কিছু শব্দের উদাহরণ উদ্ধৃত হলো (বন্ধনীতে সাধু প্রতিশব্দ সংযোজিত হয়েছে) :

কাউয়া (কাক)	ডিবা (কৌটা)	থোড় (কলার মোচা)
কেলা (কলা)	তোরই (ঝিঙ্গে)	মাঠা (ঘোল)
কেঁথা (কাঁথা)	থোত্মা (চিবুক)	গোছোল (স্নান)
কেদা (কাদা)	পসোম (লোম)	দুবলা (দুর্বা)
খিরসা (পাতক্ষীর)	বরই (কুল)	নাড়া মাথা (নেড়ে মাথা)
গাড়া (গর্ত)	কৈতর (কবুতর)	খামাখা (আহতুক)
ছফরি আম (পেয়ারা)	খাট্টা (টক)	করার (প্রতিজ্ঞা)
জড় (শিকড়)	গোদারা (খেয়া)	তাগা (সুতা)
ঠোসা (ফোস্কা)	সুরুয়া (ঝোল)	ছোকলা (খোসা)
জাড়া (শীত)	গাহাক (গ্রাহক)	রেজগি (টাকার খুচরা)।

মুনশী নিজে যে ভাবে উচ্চারণ করতেন, অভিধানে শব্দগুলিকে তিনি ঠিক সেভাবেই লিখেছেন। কোনো সংশোধন বা সংস্কার করেননি। হ্যালহেডের এই মুনশী পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন। একারণেই এই শব্দকোষের বিভিন্ন শব্দের বানানে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

১. স্বরভক্তি : কৈল্লান (কল্যাণ), রইক্ষা (রক্ষা), ডাকাইত (ডাকাত) ইত্যাদি।

২. অপিনিহিতি : কইলকা (কল্কে), চাইর (চারি), থোইল (থলি), রাইত (রাতি), আইজ (আজি)।

৩. মহাপ্রাণতা লোপ : গোন্দো (গন্ধ), বন্দু (বন্ধু), সাদু (সাধু), সন্দাকাল (সন্ধ্যাকাল), চোক (চোখ), গন্দক (গন্ধক)।

৪. অনুনাসিকের পরিবর্তে নাসিক্য-ব্যঞ্জনের ব্যবহার : গেন্দা (গাঁদা ফুল), চান্দ (চাঁদ), বান্দর (বাঁদর), ফান্দ (ফাঁদ)।

৫. 'প' এর মহাপ্রাণতা ঃ ফুস্ফ (পুষ্প), সাফ্লা (শাপলা), আলাফ (আলাপ)।

মুনশীর ভাষার নমুনা বিচার করে অনুমান করা হয় যে, তিনি নোয়াখালী অঞ্চলের লোক ছিলেন [মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ১৯৮৭ : ২২ ; পবিত্র সরকার ১৯৮১ : ৪৩]। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হ্যালহেডের মুনশী সংকলিত এই অভিধান প্রথম আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় একটি বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[৩] ৯৮টি পত্র সম্বলিত এই খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লিপিকৃত বলে অনুমান করা হয় [পঞ্চানন মণ্ডল ১৯৮০ : ৩৮৮]। বাংলা অভিধানের এই পুঁথিতে বর্ণানুক্রমিক বাংলা শব্দ ও শব্দার্থ সংকলিত হয়েছে। ইত:পূর্বে, এ ধরণের সম্পূর্ণ বাংলা অভিধান প্রণয়নের কোন প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যাযনি। এ কারণেই এই অভিধানটি পথিকৃতের দাবীদার। এ অভিধানে আরবি ফারসি শব্দ নেই বললেই চলে এবং তৎসম শব্দের সংখ্যাও এতে খুবই কম। আমরা এখানে এ অভিধানের উল্লেখ করছি এ কারণে যে, অভিধানটির শব্দসম্ভার প্রধানত তদ্ভব ও দেশজ শব্দে সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ অভিধানের কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ উদ্ধৃত হলো :

অলাত- পোড়া কাষ্ঠ, অঙ্গার, কয়লা।
আওভাও- অভ্যর্থনা, সমাদর।
আকাট-অনাবৃষ্টি।
আট কপালিয়া- দুর্ভাগ্যযুক্ত।
আটল- দুঁড়িয়া, আড়া, বক্রীভূত
আটলা- বিড়া, আটি।
আকা- চুলা।
আগুনখাগি- সতী, সহগামিনী।
আটকোল-অনুমান, যুক্তি।
আদকপালিয়া- শিরঃপীড়া।

আতাই- বেতন বিনা বাদ্যকর।
উজি- জনরব, জনশ্রুতি।
একচালা-ঝোপড়ী, কুটীর।
আপান - মদ্যপসমূহ।
উড়কুড়- আদ্যন্ত, শেষ, সমাপ্ত।
একবাগিয়া- স্বমতাবলম্বী, অবাধ্য।

বিশ্বভারতীর বাংলা অভিধানটির সংকলক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, অথবা কারো পৃষ্ঠ-পোষকতায় অভিধানটি সংকলন করেন, সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে একথা নিশ্চিত যে, এ তিনটি শব্দকোষে পৃষ্ঠপোষক, সংগ্রাহক বা সম্পাদক যিনিই থাকুন না কেন, মূল শব্দ-সংগ্রাহক ছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষ, যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের মুখের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দমালাকে অভিধানে স্থান করে দিয়েছেন। তাঁদের এ অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। অভিধান তিনটির আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, পরবর্তীকালে এরূপ দেশজ-শব্দবহুল বাংলা অভিধান আর প্রকাশিত হয়নি। কারণ, অধিকাংশ বাংলা অভিধানে মূলতঃ সাহিত্যে ব্যবহৃত তৎসম, তদ্ভব এবং দেশী-বিদেশী শব্দাবলি সংকলিত হয়েছে। কোন কোন অভিধান সংস্কৃত অভিধানের, বিশেষ করে অমরকোষের, প্রভাবে আক্রান্ত এবং কোনো কোনো অভিধানে এমন শব্দ স্থান পেয়েছে, যা সাহিত্যেত নয়ই, সাধারণ মানুষের কথাবার্তায়ও কোনোদিন ব্যবহৃত হয় না।

এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর কয়েকজন বিদেশী প্রাচ্যবিদের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এঁরা প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী হন এবং নানান তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে উদ্যোগী হন। এদেশের ভাষাচর্চায় উৎসাহী কয়েকজন প্রাচ্যবিদের ভাষাতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতার পরিচয় আমরা এখানে তুলে ধরবো।

উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটির একজন মিশনারী হিসেবে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা এসে পৌঁছেন। তিনি এদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং বাইবেল ও অন্যান্য প্রচারপুস্তক প্রকাশের জন্য হুগলীর নিকটে শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮০১ সালে তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। বাংলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচনা ছাড়াও বাংলা ভাষার সুবৃহৎ অভিধান (Dictionary of the Bengalee Language, Vol I-1818, Vol.II- 1825] এবং বাংলা ব্যাকরণ [A Grammar of the Bengalee Language, 1801) প্রণয়ন কেরীর জীবনের অন্যতম কীর্তি। মারাঠা, সংস্কৃত, পাঞ্জাবি, কর্ণাট, তেলিঙ্গা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণও কেরী কর্তৃক প্রণীত হয়

কেরী প্রণীত বাংলা ভাষার অভিধানে অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃত নিয়মে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু তাঁর সংকলিত *কথোপকথন* (১৮০১) গ্রন্থে স্ত্রীলোকের ভাষায় এবং নিম্নবর্ণের লোকের ভাষায় গ্রাম্য বা লৌকিক শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি। এ জাতীয় শব্দ সমকালীন বা পরবর্তীকালের কোনো অভিধানে স্থান পায়নি।

বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ উইলিয়াম কেরীকে ভারতীয় ভাষাসমূহে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশে উজ্জীবিত করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৩টি ভারতীয় ভাষার একটি সুবৃহৎ শব্দকোষ প্রণয়নের কাজে হাত দেন। *ইউনিভার্সাল ডিকশনারি* বা *পলিগট ভোকাবুলারি* নামে পরিচিত এই শব্দকোষে (১) সংস্কৃত, (২) কাশ্মীরী ভাষা, (৩) পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর ভাষা, (৪) মধ্য দেশীয় ভাষা, (৫) পার্বতী ভাষা, (৬) মিথিলা-ভাষা,(৭) বাংলা ভাষা, (৮) উৎকল ভাষা, (৯) মহারাষ্ট্র ভাষা, (১০) কর্ণাটক ভাষা,(১১) গুর্জ্জর ভাষা, (১২) তৈলঙ্গ ভাষা (১৩) দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষার শব্দ সংকলিত হয়[সজনীকান্ত দাস ১৩৫৩ : ১০০]।

কেরী এই কাজটি সম্পূর্ণ করেন, কিন্তু, ১৮১১ সালে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় এক অগ্নিকাণ্ডে অন্যান্য বহু মূল্যবান পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই শব্দকোষটির অনেকাংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের পর উইলিয়াম কেরী ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার জরিপ বা তুলনামূলক বিচারের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁর অন্য দুই সহযোগী মিশনারি মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড ১৮১৬ সালে এই জরিপটি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন। কেরী প্রমুখের এই ভাষা-প্রতিবেদনে ৩২টি ভারতীয় ভাষার নমুনা মুদ্রিত হয়। এতে ছিল প্রতিটি ভাষার to be ক্রিয়ার বর্তমান ও অতীতকালের শব্দরূপ এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার শব্দানুবাদ। উদ্ধৃত নমুনার ভাষাগুলো হচ্ছে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, কাশ্মীরী, ডোগরা, লোহন্দী, সিন্ধী, দক্ষিণ সিন্ধী, কচ্ছ, গুজরাটি, কঙ্কন, পাঞ্জাবী, বিকানীর, মাড়বার, জয়পুরা, উদয়পুরা, হারুতী, মালবা, ব্রজ, বুন্দেল খণ্ড, মারাঠা, মগধ বা দক্ষিণ বিহার, উত্তর কৌশিলা বা অবধী, মৈথিল, নেপাল, আসাম, উড়িয়া, তেলিঙ্গা, কর্ণাট, পশ্‌তু, বালুচী, খাসিয়া এবং বর্মী।

স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থের ভূমিকা-খণ্ডে কেরীর এই প্রতিবেদনকে, 'ভারতীয় ভাষাসমূহের পদ্ধতিগত ভাষা-জরিপের প্রথম প্রয়াস' (The first attempt at a systematic survey of the languages of India) বলে উল্লেখ করেন [Grierson. Vol. 1. Pt 1 : 12]।

প্রসঙ্গতঃ গ্রিয়ারসন এই ভাষা- জরিপ- প্রয়াসের দুটি ত্রুটির উল্লেখ করেন। একটি হচ্ছে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাকে আর্য ভাষা রূপে চিহ্নিত করা (অবশ্য স্বতন্ত্র ভাষা-গোষ্ঠী হিসাবে দ্রাবিড় ভাষা তখনও চিহ্নিত হয়নি)। দ্বিতীয়

ত্রুটি হচ্ছে, প্রতিবেদনে 'ভাষা' (Language) এবং 'উপভাষা' (Dialect)-কে একাত্ম করে ফেলা [Grierson. Vol. 1. Pt. 1: 13]।

উনিশ শতকের প্রথম দশকেই সরকারি উদ্যোগে ভারতীয় ভাষাসমূহের জরিপ অথবা তুলনামূলক শব্দ বিচারের কাজ শুরু হয়। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টো ১৮০৮ সালে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভিজিটর (Visitor) হিসাবে প্রদত্ত ভাষণে বলেন "রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শব্দ সংগ্রহের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, স্যার জেমস্ ম্যাকিনটস্ তা অনুসরণ করে ভারতীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক শব্দকোষ প্রণয়নের কাজ শুরু করেছেন। কাজটি অবশ্যই বিশেষ প্রশংসনীয়" [Roebuck, 1819 : 156]।

বোম্বাইয়ের বিচারপতি জেমস্ ম্যাকিনটস্ (বোম্বাইয়ে অবস্থান ১৮০৬-১৮১১) তুলনামূলক শব্দকোষ প্রণয়নের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, তা সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। লর্ড মিন্টোর ভাষণ থেকে আরো জানা যায় যে, ম্যাকিনটস্-এর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ কাউন্সিল ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার শব্দ সংকলনের জন্য একটি শব্দ তালিকা অনুমোদন করেন [Roebuck, 1819 : 157]।

এই উদ্দেশ্যে দুই প্রস্ত শব্দতালিকা মুদ্রিত হয়। এক প্রস্তে থাকে ফার্সি এবং হিন্দুস্থানি শব্দ এবং অন্য প্রস্তে থাকে সংস্কৃত এবং বাংলা শব্দমালা [Ranking, 1925 : 196]। চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট এ. সি. মাস্টার্স ফার্সি ও হিন্দুস্থানি শব্দতালিকা অনুসরণে চট্টগ্রাম অঞ্চলের "মগ' ভাষার একটি শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। লর্ড মিন্টো ১৮১০ সালের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কলেজের বার্ষিক সভায় তাঁর ভাষণে মাস্টার্স সংকলিত শব্দকোষের ভূয়সী প্রশংসা করেন। [Roebuck, 1819 : 263]।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষ ডা. জন লিডেনকে মাস্টার্স সংকলিত শব্দকোষ পরীক্ষা করতে দেন। লিডেনের পরামর্শক্রমে কলেজ কাউন্সিল চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসীদের শব্দ সংকলনেরও সুপারিশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মাস্টার্স সাহেব অন্যত্র বদলী হয়ে যান এবং সে কাজটি আর সম্পন্ন হয়নি।

ডা. জন লিডেন (১৭৭৫-১৮১১) ১৮০৩ সানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগদান করে মাদ্রাজে চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কাউন্সিলের সহকারী সচিব পদে নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি কলেজের হিন্দুস্থানি ও ফার্সি ভাষার পরীক্ষকের দায়িত্বও পালন করেন।

১৮০৯ সালে তিনি কলকাতায় 'কমিশনার অবদি কোর্টস' পদে নিযুক্ত হন। ১৮১১ সালে ডা. লিডেন লর্ড মিন্টোর সঙ্গে জাভা দ্বীপে যান এবং সেখানেই তিনি পরলোক গমন করেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভাষা বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী হন। তিনি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা এবং তুলনামূলক ভাষা বিচারের উদ্দেশ্যে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত সহস্রাধিক পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[৪]

ডা. লিডেন সংগৃহীত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি দেখে স্পষ্টই মনে হয় যে, তিনি একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভাষা-জরিপের কাজ শুরু করেছিলেন। বাংলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার জরিপ বা শব্দসংগ্রহের কাজে লিডেনের প্রধান সহযোগী ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের মুনশী গদাধর তর্কবাগীশ।

লিডেনের ভাষা জরিপের প্রধান ভাষাকর্মী গদাধর একাজের জন্য একটি সুন্দর শব্দতালিকা বা কর্মপত্র প্রণয়ন করেন। উড়িয়া ভাষার শব্দ সংগ্রহের জন্য যে কর্মপত্র তৈরি করা হয়েছিল তাতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার শব্দ তালিকা লক্ষ করা যায়। এই কর্মপত্রে বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিশব্দ লেখা হয়েছে। এতে তৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি আঞ্চলিক বা দেশজ শব্দও লক্ষ করা যায়। সম্ভবত শব্দ-সংগ্রহের সুবিধার্থেই এটি করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা উক্ত কর্মপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার শব্দ-তালিকা উদ্ধৃত করছি :

(সংস্কৃত - দেবনাগরী হরফে)	(বাংলা)
ভগবান	পরমেশ্বর সর্ব্বেশ্বর
নভঃ	আকাশ নভ অন্তরীক্ষ শূন্য
পিতা	পিতা জনক বাপ
মাতা	মাতা জননী মা
আত্মজ	পুত্র পো
আত্মজা	পুত্রী দুহিতা কন্যা ঝি মায়া
সহোদর	ভ্রাতা ভাই
সহোদরা	ভগিনী বোন
ভর্তা	স্বামী ভাতার
পত্নী	ভার্য্যা মাউগ
কুমারী	কন্যকা কুমারী
বালক	শিশু ছাওয়াল

[ব্রিটিশ লাইব্রেরি পাণ্ডুলিপি Add -২৬৫৯৫: ১৪৭]

গদাধর বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষার শব্দ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপত্র প্রস্তুত করতেন। এই কর্মপত্রের এক প্রান্তে থাকত বাংলা শব্দ আর অন্য প্রান্তটি থাকত ফাঁকা, যাতে শব্দসংগ্রাহকগণ নিজ নিজ ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিশব্দ লিখে দিতে পারতেন। শব্দসংগ্রাহকদের পূরণকৃত ত্রিপুরা., কুকি, খাসি প্রভৃতি ভাষার কর্মপত্র ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রয়েছে [Add, 26595 : 128-146, Add 26594 : 81-89, Add. 26595 : 60-67]। লিডেনের প্রধান ভাষাকর্মী হিসাবে গদাধরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। গদাধর বিভিন্ন কর্মপত্রে শব্দসংগ্রাহকদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-নির্দেশিকাও প্রদান করতেন। কুকি ভাষার শব্দসংগ্রহের জন্য গদাধর প্রণীত কর্মপত্রের শেষ পৃষ্ঠাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

সূর্য রবি
চন্দ্র সোম
মঙ্গল
বুধ
বৃহস্পতি
শুক্রে
শনি
রাহু
কেতু
মেষ
বৃষ
মিথুন
কর্কট
সিংহ
কন্যা
ধনু
মকর
কুম্ভ
মীন
ইহার পর ২৭ নক্ষত্রের নাম পল বিপল দণ্ডাদির নাম মাসা রতি সের পসোরি ওজনের যত নাম গুঁঠ বিস্বাদি যত নাম সে দেশীয় ভাষে লেখিবা এবং দেশীয় অক্ষর অকাদি স্বর ককারাদি অক্ষর তারপর দেশীয় ভাষা তে যে যে পুস্তক লেখিয়া পাঠাবা।

ত্রিপুরা ভাষার শব্দ-সংগ্রহের জন্য যে কর্মপত্রটি প্রণীত হয়েছিল, তাতে লক্ষ করা যায় যে, শব্দসংগ্রাহকের উদ্দেশ্যে রচিত নির্দেশাবলি একটু ভিন্ন। যথা ঃ

> ইহার পর বারের নাম তারপর বৎসরের নাম তারপর গ্রহদের নাম তারপর সমস্ত দেবতাদের নাম তারপর রাশিনক্ষত্রের নাম তারপর মুহূর্ত দণ্ড পলাদির নাম তিথি পক্ষ অয়ন বৎসর রতি মাসা মাপ ওজনের সমস্ত নাম আপন ২ ভাষাতে আপন ২ অক্ষরতে লেখিয়া পঠাইবা এবং স্বর ও ব্যাঞ্জন যত অক্ষর যথা অনুক্রমে লেখিয়া পঠাইবা আর আপন্ ২ ভাষাতে যে যে পুস্তক তাহা পঠাইবা

ডা. লিডেনের পরিকল্পিত ভাষা-জরিপের কাজটি তাঁর অকাল মৃত্যুতে শেষ হতে পারেনি। তিনি এই উপমহাদেশে মাত্র আট বৎসর কাল অবস্থান করেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে তিনি আফগানিস্তান থেকে শুরু করে জাভা দ্বীপ পর্যন্ত এই বিরাট ভূ-খণ্ডের যাবতীয় ভাষার যে ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করেন তা বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব। তবে বাংলাভাষার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের কাজে লিডেনের অন্যতম সহযোগী মুনসী গদাধরও যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার যথাযথ স্বীকৃতি একান্তই বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষা-জরিপ এবং আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়নের কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন ভাষাতত্ত্ববিদ স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। এই উপমহাদেশে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাগুলির সুবিস্তৃত বিবরণী তিনি ১৯০৩ -১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* শীর্ষক গ্রন্থাবলিতে প্রকাশ করেন।[৫] এই গ্রন্থাবলিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থাবলির প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় উপখণ্ডে ভারতীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক শব্দকোষ রয়েছে। এতে ২১৬ টি নির্বাচিত শব্দের ৮৪৯টি ভাষার প্রতিশব্দ উদ্ধৃত। এক অর্থে এটি আঞ্চলিক ভাষারও অভিধান। গ্রন্থাবলির পঞ্চম খণ্ডের প্রথমাংশে বাংলা ও আসামি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিবরণী পরিলক্ষিত হয়। এই খণ্ডে গ্রিয়ারসন বাংলার উপভাষাসমূহের অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিকরণ করেছেন। তা ছাড়া, বাংলার উপভাষার শ্রেণিকরণের একটি মানচিত্রও উক্ত খণ্ডে প্রদত্ত হয়েছে।

গ্রিয়ারসনের মতানুসারে বাংলার উপভাষাসমূহ
(জেলাভিত্তিক শ্রেণীকরণ)

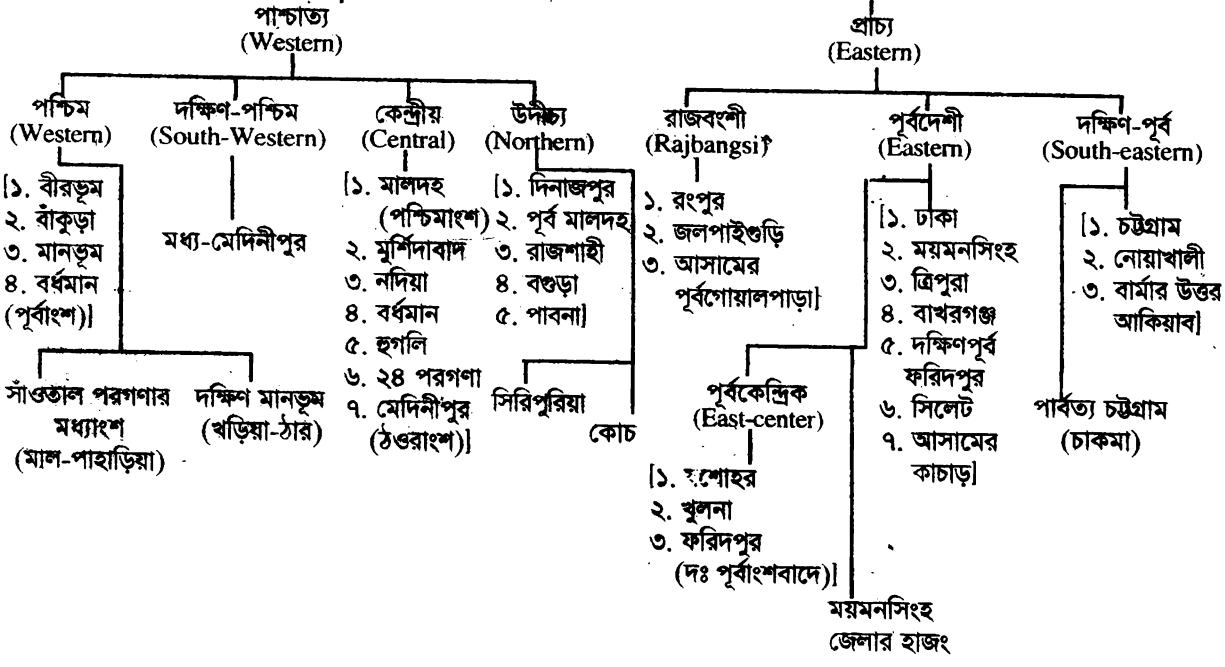

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে 'এটি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান সম্মত হয় নাই', কারণ গ্রিয়ারসনের সময়ে 'দেশে ভাষাবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অবশ্য স্বীকার করেন যে, 'এই ভাষা বিবরণীই আমাদের উপভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের একমাত্র সোপান না হইলেও আমাদের প্রধান অবলম্বন ' [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৬৫-ক : ৯]।

প্রসঙ্গত স্যার গ্রিয়ারসনের *বিহার পেজ্যান্ট লাইফ* (Bihar Peasant Life-1885) শীর্ষক গ্রন্থের উল্লেখ করা আবশ্যক। এ-গ্রন্থে পল্লির কৃষক-জীবন, কৃষিকর্ম ইত্যাদি বিষয়ক প্রায় বার হাজার শব্দ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থ শেষে বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি দেয়া হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন উপভাষার শব্দ সংগ্রহ বা অভিধান প্রণয়নের কাজে অনেকেই এই গ্রন্থকে আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশের উপভাষার অভিধান রচনায় প্রথম সচেষ্ট হন এফ. ই. পারজিটার (F. E Pargitar)। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে *ভোকাবুলারি অব পিকিউলিয়ার বেঙ্গলী ওয়ার্ডস (Vocabulary of Peculiar Bengali Words)* পুস্তকটি প্রণয়ন করেন। পারজিটার তদানীন্তন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। একজন বিদেশী লোকের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এ জাতীয় একটি দুরূহ কাজ সম্পাদনের যে সীমাবদ্ধতা ছিল তা অনস্বীকার্য। অজস্র ভুল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পারজিটারের এই *'ভোকাবুলারী'* বাংলার আঞ্চলিক ভাষার প্রথম অভিধান, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আঞ্চলিক বা গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীকে নিয়ে একটি শব্দ সমিতিও গঠিত হয়।[৬] ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়।

১২৯৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৩০৮ সালের *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগৃহীত 'শব্দ সংগ্রহ' । এই শব্দ সংগ্রহটি সম্পূর্ণ রূপে আঞ্চলিক বা গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ হলেও বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ সংগ্রহ ছিল। বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ ছাড়াও যে সব তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এটি তারই একটি সংকলন। এতে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ। যেমন :

ক. তদ্ভব, দেশজ বা গ্রাম্য শব্দ— আনাজ, আখাম্বা, আধকপালিয়া, আইস, কাওআ, কাস্তিআ, খাট্টা, খাবলা, খিরা, খিরসা, গলুই, খালই, ইট খোলা, ওসার ইত্যাদি।

খ. আরবি ফার্সি শব্দ— আজব, আখেজ, আদত, আস্‌নাই, আস্‌কারা, ইস্তফা, ইলিম, ইরসাল, আএব, একিদা, গজল, ওআরিস, ইস্তাহার ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ— ইষ্টিমার, এগজামিন, এক্সিকিউটর, কমফর্টর, কালেক্টর, কালেজ, কোম্পানী ইত্যাদি।

ঘ. অশিষ্ট শব্দ— আদামাদা, খানকী, খানকীপনা, গতরখাকুয়া ইত্যাদি।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক এই শব্দ সংগ্রহের ভূমিকায় (১৩০৮) উল্লেখ করেন যে, 'একখানি বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত অভিধান' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য সহকারে' এই খাঁটি 'বাংলা শব্দ সংকলনে' প্রবৃত্ত হয়েছিলেন [হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৫ : ১৪৩]।

বিদ্যাসাগরের এই শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার পর *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ সংকলন প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে ১৩০৮ থেকে ১৩৫১ পর্যন্ত *পরিষৎ পত্রিকায়* প্রকাশিত বিভিন্ন শব্দ সংকলনের একটি তালিকা তুলে ধরছি।

১। শব্দ সংগ্রহ— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৩০৮)।
২। গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ (বরিশাল)— সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৩০৯)।
৩। ময়মনসিংহের গ্রাম-ভাষা— রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার(১৩১২)।
৪। রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা— সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী (১৩১২)।
৫। মালদহের গ্রাম্য শব্দ— রজনীকান্ত চক্রবর্তী (১৩১৪)।
৬। গ্রাম্য শব্দ-কোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহ— রাজকুমার কাব্যভূষণ (১৩১৪)।
৭। যশোহরের গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ— মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য (১৩১৫)।
৮। কোচ ও রাজবংশী শব্দ সংগ্রহ— সত্য সুন্দর বসু (১৩১৫)।
৯। ঢাকার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ— পরমেশ প্রসন্ন রায়(১৩১৬)।
১০। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ— দেবেন্দ্রনাথ বসু (১৩১৬)।
১১। মালদহের পল্লীভাষা— হরিদাস পালিত (১৩১৮)।
১২। কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য— অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৩১৮)।
১৩। বগুড়া জেলায় প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ— সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত (১৩১৯)।

১৪। নদীয়া জেলার গ্রাম্য শব্দ— চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় (১৩১৯)।

১৫। ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ— দেবনারায়ণ ঘোষ (১৩১৯)।

১৬। ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার অভিধান— কৃষ্ণনাথ সেন (১৩২১)।

১৭। মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা— হরিনাথ ঘোষ (১৩২১)।

১৮। জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ) গ্রাম্য শব্দ— রাখাল রাজ রায় (১৩২২)

১৯। চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা— বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩২৬)।

২০। খুলনা জেলার মাঝির ভাষা— নরেন চক্রবর্তী (১৩৩১)।

২১। শব্দ সংগ্রহ (৩টি)— মোল্লা রবীউদ্দীন আহ্‌মদ্‌ (১৩৩৩)।

২২। শব্দ সংগ্রহ -মোল্লা রবীউদ্দিন আহ্‌মদ্‌ (১৩৩৪)।

২৩। বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ— গৌরীহর মিত্র (১৩৩৪)।

২৪। ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ— চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (১৩৩৪)।

২৫। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গ্রাম্য সঙ্গীত— শরৎচন্দ্র ঘোষ (১৩৩৫)।

২৬। শ্রীহট্টজেলার গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ— কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী (১৩৩৭)।

২৭। ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত আচার নিয়মের বিবরণ—কামিনী কুমার রায় (১৩৩৯)।

২৮। দক্ষিণ বঙ্গের কথ্য ভাষা— অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫০)।

২৯। নদীয়ার ভাষা— চিন্তাহরণ চক্রবর্তী— (১৩৫১)।

৩০। জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা— মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৫১)।

উপরের তালিকার শব্দ-সংগ্রহগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত হলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ সম্ভারের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন এখানে পরিলক্ষিত হয়।

মোল্লা রবীউদ্দিন আহ্‌মদ-এর গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সংগ্রহ *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার* দু'টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একটি ১৩৩৩ বর্ষের ২য় সংখ্যায় (পৃ. ১০৯-১২২) এবং দ্বিতীয়টি ১৩৩৪ বর্ষের ১ম সংখ্যায় (পৃ. ১২-২৪)। শব্দ-সংগ্রহের সঙ্গে প্রদত্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয়ের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদ রিপন কলেজের ভাষাতত্ত্বের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তিনি গ্রিয়ারসন সাহেবের *বিহার পেজেন্ট লাইফ* গ্রন্থের শব্দ তালিকা অনুসরণ করে মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষক ও কৃষি বিষয়ক শব্দাবলি সংকলন করেন [হুমায়ূন আজাদ ১৯৮৫ : ২৬৫]।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি চিত্রসহ বিভিন্ন শব্দের তালিকা তুলে ধরেন। যেমন, লাঙ্গলের চিত্র দিয়ে তিনি লাঙ্গলের ১৬টি অংশের বিভিন্ন নাম উদ্ধৃত করেন। যেমন : মুঠো/লিজেন/ঈশ/ শাল, আড়চাল্ / আমড়া/ ফাল/ পাশি/ লাশ/ গাদা / জুতি; যুতি, যোতে / শলি, শলাকা/ যোয়াল বা যুঁয়াল/ লাঙ্গলা দড়ি /আঁকড়ো /ওয়াঁল, উয়াল/ পান।

অনুরূপ রবীউদ্দিন আহ্মদ গরুর গাড়ির একটি চিত্রসহ গরুর গাড়ির ২৩টি বিশিষ্ট অংশের নাম উল্লেখ করেছেন :

লাহা/পুঁঠে/ আরা /ধূর /রুন-খিলি/ পচড়া/ চাত্‌রা/ ফড়/ খাতা/ শাঁড়োক/যোয়াল/ শলি/ কানফলি/ সিঁতেকাটী/মোড়ান কাটা/ মোড়ান দড়ি/ বাঁগোড়/ উলো চুল /পেয়ে / মুচ/ বেড় বুন্দ/ হা'ল।

রাজকুমার কাব্যভূষণের *গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহ* বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তিনি একটি গ্রাম্য-শব্দ-কোষ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে উনিশটি জেলার শব্দ সংগ্রাহকের সহায়তায় আঞ্চলিক শব্দাদি সংগ্রহ করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি পাবনা জেলার কিছু শব্দ বিষয়ানুসারে (যেমন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পশু-পক্ষী, মৎস্য, শস্যাদি ইত্যাদি) তালিকাবদ্ধ করেন। গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে, তিনি একার্থবাচক কিছু শব্দের অঞ্চল ভেদে নামান্তর তুলে ধরেন। যেমন :

পারাবত = পায়রা (হুগলী , হাওড়া), কৈতর (ময়মনসিংহ), কবুতর (নদিয়া), কতুর (পাবনা)।

বার্ত্তকু = বেগুন (হুগলী, হাওড়া), বাই অন(চট্টগ্রাম) বাওন- (যশোহর), বাইগুন (সিংহভূম)।

মই = মই (হুগলী , হাওড়া), চগো (পাবনা), বাঁশই (যশোর) সাঙ্গড় (খুলনা)।

রাজকুমার কাব্যভুষণ তাঁর পরিকল্পিত গ্রাম্য শব্দকোষের প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> আমার মতে, গ্রাম্য শব্দ কোষে (১) সকল জেলার সকল গ্রাম্য শব্দ বিন্যস্ত হওয়া উচিত; (২) গ্রাম্য ভাষায় যদি কোন সাধু শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, শব্দ কোষে তাহাদিগেরও সংস্থান হওয়া আবশ্যক; (৩) যতদূর সম্ভব শব্দের সাধুভাষায় অর্থ ও তৎশব্দ ব্যবহার কোন গ্রন্থকৃত প্রয়োগ বা প্রাদেশিক ছড়াংশ উদ্ধৃত করা বিশেষ প্রয়োজনীয় [হুমায়ূন আজাদ ১৯৮৫: ২৫১]।

রাজকুমার কাব্যভূষণ তাঁর এই পরিকল্পনা দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি। কিন্তু সুদীর্ঘকাল পরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা করেন তা এক অর্থে প্রথম বাংলা গ্রাম্য শব্দকোষ।

॥ দুই ॥ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনের বৃহত্তম কীর্তি। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসনের *লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* (১৯০৩-১৯২৮)-র পর ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের মত বড় আর কোনো কাজ হয়নি। বিশেষ করে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার শব্দ-সম্ভার সংকলনের প্রচেষ্টাও এই প্রথম। বাংলা একাডেমী পরিকল্পিত এই আঞ্চলিক ভাষার অভিধান মূলত 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান' শীর্ষক সুবৃহৎ পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। পরিকল্পানুযায়ী 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান' তিন খণ্ডে সমাপ্ত হওয়ার কথা। পরিকল্পিত তিনটি খণ্ড ছিল নিম্নরূপ :

প্রথম খণ্ড : আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।
দ্বিতীয় খণ্ড : ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।
তৃতীয় খণ্ড : বাংলা সাহিত্য কোষ।

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (অতঃপর আঞ্চলিক ভাষার অভিধান নামে অভিহিত) তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড - স্বরবর্ণ অংশ, প্রসংগকথা ও ভূমিকাসহ, ১ থেকে ২০১ পৃষ্ঠা (১৯৬৫), দ্বিতীয় খণ্ড ব্যঞ্জন বর্ণ অংশ, ক, চ ও ট বর্গ, ১ থেকে ৪৬৮ পৃষ্ঠা (১৯৬৫), তৃতীয় খণ্ড-

ব্যঞ্জন বর্ণ অংশ, ত থেকে অবশিষ্ট বর্ণ, ১ থেকে ৫৯০ পৃষ্ঠা (১৯৬৮)। পরবর্তীকালে এই আঞ্চলিক ভাষার অভিধান *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* নামে, প্রথমে দুই খণ্ডে এবং পরে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিন খন্ডে সমাপ্য পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* প্রকাশিত হয়েছে (স্বরবর্ণ অংশ—১৯৭৪, ব্যঞ্জন বর্ণ অংশ—১৯৮৪)। কিন্তু তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'বাংলা সাহিত্য কোষ' এ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেনি।

আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের কাজ ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে শুরু হয়। শব্দ-সংগ্রহের জন্য ইংরেজিতে একটি *ফর্ম সাইক্লোস্টাইলে* মুদ্রিত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। *ফর্মটি* ছিল নিম্নরূপ :

Sl. No	Word	Meaning of the word	Locality of the Dist.. where it is used	Use with local implications i.e.. examples showing the uses of the word in the locality	Different - Phonetic representation with name and locality i.e different pronunciation of the word according to spelling	Derivation, if possible	Special remarks, if any, about the word
1	2	3	4	5	6	7	8

শব্দ সংগ্রহের আবেদনপত্র বিভিন্ন সংগ্রাহকদের কাছে বিলি করার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রেরণ করা হয় :

(ক) ঢাকা, রাজশাহী ও করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ;

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষ;

(গ) প্রদেশের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক;

(ঘ) বিভিন্ন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী;

(ঙ) বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক;

(চ) বিভিন্ন ক্লাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উপভাষা-জরিপের উদ্দেশ্যে প্রচলিত Close system ও Open system-এর মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের জন্য শব্দ সংগ্রহ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অর্থাৎ সুনির্ধারিত শব্দ তালিকাসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা শব্দ সংগ্রহ না করে, সর্বসাধারণের কাছে আঞ্চলিক শব্দ (অর্থ ও প্রায়োগসহ) সংগ্রহ করে প্রেরণের আবেদন জানানো হয়। লক্ষ করা যায়, বাংলা একাডেমীর এই ইংরেজি আবেদন-পত্র বিলি করার পর আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি, মাত্র ৯৬ জন সংগ্রাহক প্রায় একুশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করে পাঠান । পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বশ্রেণির জনসাধারণের কাছে আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহের বিশেষ আবেদনও জানানো হয়। সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তিতে শব্দ-সংগ্রহের জন্য সমুচিত সম্মানী প্রদানের কথাও উল্লেখ করা হয়। ফলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সংগ্রাহকদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। ৪৫৩ জন সংগ্রাহক তিন বৎসরের মধ্যে (১৯৫৮-১৯৬১ খ্রি. পর্যন্ত) ৭৫১ কিস্তিতে মোট ১,৬৬,২৪৬টি আঞ্চলিক শব্দ পাঠান। সংগ্রহের পারিশ্রমিক বাবদ বিভিন্ন সংগ্রাহককে মোট ২২,৬৮৬ টাকা প্রদান করা হয়। জীবিকা অনুসারে লক্ষ করা যায় - মোট সংগ্রাহক-সংখ্যার অর্ধাংশই ছিল অধ্যাপক ও শিক্ষক,

এক-চতুর্থাংশ ছিল ছাত্র আর বাকি এক-চতুর্থাংশ ছিল বিভিন্ন কর্মজীবী। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে স্বরবর্ণ অংশের ভূমিকায় বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন পরিচালক অধ্যাপক আলী আহসান রচিত 'প্রসঙ্গকথা'য় শব্দ সংগ্রহ সংক্রান্ত এসব তথ্য বিবৃত হয়েছে [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৫ : ক-ভ]।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে শব্দ সংগ্রাহকগণ আঞ্চলিক শব্দ পাঠান। বাসস্থান অনুসারে সংগ্রাহকদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

ঢাকা-১১৪, রংপুর-১৭, রাজশাহী-৪২, যশোহর-১৩, ময়মনসিংহ-৪১, বাখেরগঞ্জ-১২, কুমিল্লা-৪০, বগুড়া- ৯, খুলনা-৩৯, কুষ্টিয়া-৮, পাবনা-৩১, দিনাজপুর-৬, সিলেট-৩০, নোয়াখালী-৫, চট্টগ্রাম-২৪, পার্বত্য চট্টগ্রাম-১, ফরিদপুর-২০, করাচী-১। মোট- ৪৫৩।

সংগ্রাহকদের বাসস্থান বলতে আমরা তাদের কর্মস্থল অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানস্থল বুঝব। কারণ, সংগ্রাহকদের স্থায়ী ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের কোনো প্রচেষ্টা তখন হয়নি। এমনকি সংগ্রাহকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শব্দ-সংগ্রহের ভাষাতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও কোন তথ্য সংগৃহীত হয় নি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান' প্রকল্পের প্রধান সম্পাদক হিসাবে বাংলা একাডেমীতে যোগদান করেন। তিনি যখন যোগদান করেন, তখন আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ প্রায় সমাপ্ত। তিনি দীর্ঘকাল পূর্বে ১৯২০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক আহূত এক ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন :

> The English Dialect Dictionary প্রায় তিনশত স্বেচ্ছা-সাহিত্যসেবকের যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের প্রাদেশিক বিভাষা সংগ্রহের জন্য আমরা কি বাঙ্গালায় প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটি করিয়া উদ্যোগী ছাত্র সাহিত্যসেবক পাইব না ? [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৯ : ৩৩]।

অনুমান করা যায়, ড. যোশেফ রাইট সম্পাদিত *ইংলিশ ডায়ালেক্ট ডিকশনারী* (English Dialect Ductionary)-র কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ড. শহীদুল্লাহ অবহিত ছিলেন। তিনি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পের শুরু থেকেই যদি জড়িত থাকতেন, ত হলে হয়ত সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগৃহীত হতো।

লক্ষ করা যায় যে, সকল জেলা থেকে সমানভাবে শব্দ সংগৃহীত হয়নি। ঢাকা শহরে অবস্থানরত সংগ্রাহকরা বিভিন্ন জেলার শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, যার ফলে

সংগ্রাহকদের অজ্ঞাতসারে শব্দের যথাযথ অর্থ ও বানানে ত্রুটি ঘটেছে। এর প্রধান কারণ, সংগ্রাহকগণ যেমন অনভিজ্ঞ ছিলেন তেমনি একাডেমী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ও ধ্বনিলিপি সম্পর্কেও কোন নির্দেশ প্রদান করেন নি। প্রায় দেড় লক্ষাধিক আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হলেও সকল শব্দ গ্রহণ-যোগ্য ছিলনা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পরিচালনায় এসব শব্দের বাছাই ও সংশোধনের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন কারণে বহু সংগৃহীত শব্দ বাদ দিতে হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে :

ক. সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচলিত বাংলা অভিধানের অন্তর্ভুক্ত অনেক শব্দ সংগ্রাহকগণ পাঠিয়েছেন;

খ. অনেক সংগ্রাহকই আঞ্চলিক শব্দের অর্থ যথাযথ লিখতে পারেননি। প্রয়োগের সঙ্গে শব্দের প্রদত্ত অর্থের সঙ্গতি না থাকায় অনেক শব্দ বাদ দিতে হয়েছে;

গ. সংগ্রাহকগণ বহুল প্রচলিত শব্দই বিপুল পরিমাণে পাঠিয়েছেন। এমনও দেখা গেছে একই অঞ্চলে একই অর্থে ব্যবহৃত একটি বিশেষ শব্দ প্রায় পঞ্চাশজন সংগ্রাহকই পাঠিয়েছেন;

ঘ. দুই-একজন সংগ্রাহক সম্মানী প্রাপ্তির লোভে নিজেরাই কিছু শব্দ আঞ্চলিক শব্দ বলে চালিয়ে দিয়েছেন;

ঙ. একই শব্দ-সমষ্টি বিভিন্ন সংগ্রাহকের নামে ও একাধিকবার প্রেরিত হয়েছে;

চ. কোনো কোনো সংগ্রাহকের হাতের লেখা খুবই অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য ছিল।

এভাবে বিচার-বিবেচনার পর, সংগৃহীত শব্দাবলির মধ্যে প্রায় পঁচাত্তর হাজার শব্দ গ্রহণযোগ্য হয়।

আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ, নির্বাচন ও সংশোধনের পর ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে অভিধানের শব্দ সংকলনের কাজ শুরু হয়। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়নের কাজটি সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, ড. কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি 'উপদেষ্টা উপসংঘ' গঠিত হয়। উপসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনার পর অভিধান সংকলন ও সম্পাদনা নীতিমালা নির্ধারিত হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সতেরটি আলোচনা সভায় বিভিন্ন জেলার ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জেলাসমূহের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয় এবং তদনুসারে একটি

বানান পদ্ধতিও নির্ণীত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শব্দ সংগ্রাহকগণ অনেক ক্ষেত্রেই, আঞ্চলিক শব্দের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানান লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি। সে কারণে , প্রতিটি শব্দের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বানান সংশোধন করা সম্ভব ছিল না। এজন্যই জেলা বিশেষের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শব্দের বানান পুনর্গঠিত (Reconstructed) করতে হয়েছে। শব্দ সংগ্রহ কালে, ধ্বনি-লিপির সাহায্য নেয়া হয়নি। তাই নতুন করে এই অভিধানে ধ্বনিলিপি প্রদান করা হয়নি। তবে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার সাহায্যে, জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি একটি বানান পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। যেমন :

ক. রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর ছাড়া অন্যান্য জেলার পরিবর্তিত 'চ' ধ্বনির জন্য ব্যাবহৃত হয়েছে- চ'। উদাহরণ :
চামা= [রাজশাহী]—খোসা পাতলা ডিম।
চান্‌দি = [রংপুর]—নখ।
চা'ন্‌দি =[কুমিল্লা]—নখ।
চা'মা = [নোয়াখালী]—ছায়া।

খ. রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর ছাড়া অন্যান্য জেলার পরিবর্তিত 'ছ' ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'স' (বর্ণানুক্রমে এই 'স', 'শ'-এর পরে এসেছে)। উদাহরণ :
ছন্‌চা= [রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী]—ঘরের পাশের অপ্রয়োজনীয় স্থান।
সন্‌চা'-= [বগুড়া]—ঘরের পাশে অপ্রয়োজনীয় স্থান।

গ. রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর ছাড়া অন্যান্য জেলার পরিবর্তিত 'জ' ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'য'। লক্ষণীয় বিষয়— অভিধানের বর্ণানুক্রমে এই 'য' 'জ'-এর পরে বসানো হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তিত 'স' ধ্বনিটি 'ছ' বর্ণের পরে বসেনি। উদাহরণ :
জালি= [রাজশাহী]— বাঁশের সরু বেতের তৈরী খাবার ঢাকনী।
যালি= [খুলনা, বাকেরগঞ্জ]— বাঁশের তৈরী ঢাকনা।

ঘ. 'ঝ' ধ্বনির মূল ও পরিবর্তিত উচ্চারণের জন্য যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে 'ঝ' এবং 'ঝ '। উদাহরণ :
ঝাল্‌ খাওয়া= [রাজশাহী]— প্রসূতির শরীরের ব্যথা দূরীকরণার্থে আটা ও ঝালের তৈরী এক প্রকার খাদ্য খাওয়া।
ঝা'ল মারা= [খুলনা]— ছিদ্র বন্ধ করা।

ঙ. এ্যা' ধ্বনির জন্য 'া' ধ্বনি—প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ :
এ্যাদ্‌ল = [কুমিল্লা]— জলজ উদ্ভিদ্‌ বিশেষ।
নার‍্যাল = [ফরিদপুর]— নারিকেল।

আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে শব্দ-সংকলনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি - প্রতিটি শব্দের সঙ্গে প্রচলন-স্থানের সংক্ষিপ্ত রূপই তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে। এর পর, আমরা পাই পদপরিচয়। তারপর শব্দার্থ। শব্দার্থের সঙ্গে প্রয়োগ এবং সবশেষে রয়েছে শব্দটির ব্যুৎপত্তি। কোনো শব্দের ভিন্নার্থ বা অর্থান্তর থাকলে তাও ১,২,৩ ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো শব্দের ক্ষেত্রে, দশটিরও অধিক অর্থভেদ দেখা যায়। আরো একটি বিষয় লক্ষ করা যায় যে, সব শব্দেরই প্রয়োগ-উদাহরণ বা ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়নি।

আমরা ইতঃপূর্বে এই আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের শব্দ -সংগ্রহ পদ্ধতির ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছি এবং এই ত্রুটির কারণে, পূর্ব বাংলা, তথা বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের প্রচলিত শব্দাবলি এ অভিধানে স্থান পায়নি, যদিও তা একান্তই প্রত্যাশিত ছিল। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সমালোচকগণ এই ত্রুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। যেমন, সুবীর রায় চৌধুরী এক সমালোচনায় অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর অভিজ্ঞতায় খুলনা অঞ্চলের অনেক শব্দই এই অভিধানে নেই [শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য, ১৯৮৫ : ১৮৭] । কিন্তু, এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, সংগ্রাহকগণ যে সব শব্দ এবং তার অর্থ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, শুধু সেসব শব্দ বা অর্থাবলিই এই অভিধানে সংকলিত হয়েছে।

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও আঞ্চলিক ভাষার এই সুবৃহৎ অভিধানে আমরা বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার বিচিত্র প্রয়োগ ও শব্দ-সম্পদের বিপুল সমাহার লক্ষ করি। আমরা এতে পাই বহু বিচিত্র শব্দ, তার আঞ্চলিক উচ্চারণভেদ অথবা বিভিন্ন প্রতিশব্দ, সর্বোপরি বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন অর্থ। আঞ্চলিক ভাষার এই বিচিত্র সম্ভারে এমন অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা শুধু সমাজতত্ত্ববিদ বা ভাষাতত্ত্ববিদদের কাছেই নয়, সাধারণ পাঠকের কাছেও তা কম আকর্ষণীয় নয়। নিম্নে এই অভিধানের শব্দসম্ভারের কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো :

১। অঞ্চলভেদে কোনো কোনো শব্দের বিভিন্ন রূপভেদ লক্ষ করা যায়। যেমন:

(ক) কাঠবিড়ালী— কটা (সিলেট, ঢাকা), কটাবানর (ময়মনসিংহ), কডা (বাকেরগঞ্জ), কডি (ঢাকা), কাঠ বিরেল (যশোর), ককা (সিলেট)।

(খ) কচ্ছপ > কাছিম— কত্মা (ঢাকা), কাটুয়া (ময়মনসিংহ, সিলেট), কাইচ'(পাবনা), কাইঠা (ঢাকা), কাইচা (ঢাকা)।

(গ) উদ্দংশী > উড়ুশ (ছারপোকা অর্থে)— উরুশ (ঢাকা), উরুইশ (ময়মনসিংহ), উড়শ (দিনাজপুর), উলশ (সিলেট), উলুশ (কুমিল্লা), উল্লুশ (ঢাকা)।

(ঘ) আগার > উগার (ঘরের চালের সঙ্গে বাঁধা মাচা বা ভাণ্ডার)— উগাড় (রাজশাহী), উগার (সিলেট), উগুইর (কুমিল্লা), উগুর (কুষ্টিয়া), উগইর (বগুড়া, রাজশাহী), উইর (ঢাকা)।

২। কৌতুহলী পাঠক বা গবেষক নামবাচক শব্দের (ফুল, ফল, পশু, প্রাণী ইত্যাদি) বহু বিচিত্র রূপ এই আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে লক্ষ করবেন। ক-কারাদি ও কা-কারাদি শব্দের তালিকায় আমরা প্রায় অর্ধশত ধানের নাম পেয়েছি। অবশ্য এ-নামগুলো ধানের প্রকারভেদ নয়, ধানের নামভেদ। যেমন :

কটকতারা, (ঢাকা), কনকচূ'রা (বগুড়া), কনকচূর' (খুলনা, বাকেরগঞ্জ), কনকতারা (চট্টগ্রাম) করযে বাস (খুলনা), করযামুহি (ঢাকা), কলমা (রাজশাহী), কালাপাইক্যা (চট্টগ্রাম) কালামন (চট্টগ্রাম), কালামাদারি (ফরিদপুর), কালিন্চে' (কুষ্টিয়া), কাশিয়াবান (বগুড়া), কালিহাইট্যা (কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা), কালিজিরা (রাজশাহী), কালমানিক (ঢাকা), কাঠরাংগা (খুলনা, যশোর), কাটারিভোগ (বাকেরগঞ্জ), কাতিশাইল (বাকেরগঞ্জ), কাতিশালি (বগুড়া), কাশ্যাপান্জা (রাজশাহী), কার্তিকশালি (যশোর, খুলনা), কাতিকহাইল (ঢাকা), কারাতিখাইল (ঢাকা), কাইল্যাবুরি (কুমিল্লা), কাওয়াকুলি (ঢাকা), কাঁকুয়া (রংপুর), কাচ'কলম (বগুড়া, ফরিদপুর), কাজলা (রাজশাহী), কাযলকি (ঢাকা), কাযলহাইল (ঢাকা), কানাকুরা (ঢাকা), কাটেধান (খুলনা, যশোর), কালি গাশা (নোয়াখালী), কাতি হাইল (ঢাকা), কাতি শাইল (ময়মনসিংহ), কালপাতা (পাবনা), কালিকচু (ঢাকা), কালবকরি (পাবনা), কালা আমন (ঢাকা), কালগৈরা (পাবনা), কালযাম (পাবনা), কালাকুরা (ঢাকা) কালা গরা (কুমিল্লা)।

৩। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে বিভিন্ন শব্দের একাধিক শব্দার্থ প্রদান করা হয়েছে। অঞ্চল ভেদে একটি শব্দই কি ভাবে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তা যে কোনো গবেষক বা পাঠকের কাছে বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। আমরা এ অভিধান থেকে আল্ শব্দের বিভিন্ন অর্থের নির্দশন উদ্ধৃত করছি।

আল্— (১) লাঠি লাটিম বা পাচনের আগার সূঁইবিশেষ (ঢাকা, ফরিদপুর, সিলেট, যশোহর)।

(২) মৌমাছি বা বোলতার হুল (রাজশাহী)

(৩) টিপ্পনি (খুলনা)

(৪) হাল (ঢাকা, কুমিল্লা)

(৫) জমির পরিমাণবিশেষ (সিলেট)

(৬) সূতার অগ্রভাগ (পাবনা)

(৭) মোরগের মাথার ঝুঁটি (চট্টগ্রাম)

(৮) রাগ (নোয়াখালী)
(৯) ওজর, আপত্তি (রংপুর, বাকেরগঞ্জ)
(১০) পিয়াজের চারা (রংপুর, বগুড়া)
(১১) ধানের আবাঁধা ছোট আঁটি (চট্টগ্রাম)
(১২) অবসর (রংপুর)।

৪। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে বিশেষ ভাবব্যঞ্জক ধন্যাত্মক শব্দের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গত কয়েকটির উল্লেখ করা যায় :

কুদুম্ কুদুম্ করা (কুমিল্লা, ঢাকা)= অতিরিক্ত ফূর্তি করা; কুতুর কুতুর্করা (যশোর) = আস্তে আস্তে করা; খাবু খাবু করা (পাবনা) = খাইখাই করা; খাফাযাফা (কুমিল্লা) = তাড়াতাড়ি; গান্যা গান্যি (সিলেট)=ঠাসাঠাসি; গাল্লাউ গাল্লাউ (রংপুর)= কোন দ্রব্য ঢালিবার শব্দ; গিন্দি গিন্দি (ফরিদপুর)= ছোট ছোট; চি' মাই চি'মাই (সিলেট)= ইতঃস্তত করে; খুরবুরা (রংপুর)= চটপটে; চ'দর্ বদর্ (ঢাকা) = মাতব্বরি।

৫। বিশিষ্টার্থক শব্দ বা প্রবচনেরও উদাহরণ এই অভিধানে অনেক লক্ষ করা যায়

খেউড়া গাযি (বগুড়া) = তালপাতার সিপাই; আহাম্মকের চরকি (রংপুর) = কাণ্ডজ্ঞানহীন; এ্যাক বুড়ি আরেক্ বুড়ির শাশুরি (কুমিল্লা) = অক্ষম লোক অক্ষম লোকের সঙ্গী; এ্যাক ঠোকর (ঢাকা) = মুষ্টি পরিমাণ; গুয়া মুরি আইশ্ (ঢাকা) = মুচকি বা মৃদু হাসি; চাদদের ঠেকা (ময়মনসিংহ) = বিশেষ প্রয়োজন; টান্ দেখানো (ময়মনসিংহ) = গরিমা করা।

৬। অভিধান সম্পাদনার দুরূহতম কাজ ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ। লক্ষ করা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাজার হাজার আঞ্চলিক শব্দের ব্যুৎপত্তি অনায়াসে নির্ণয় করেছেন। ইতঃপূর্বে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পর্যালোচনায়, বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনায় এবং করাচীর উর্দু উন্নয়ন সংস্থা পরিকল্পিত উর্দু অভিধানের সম্পাদনায় তাঁর ব্যুৎপত্তি নির্ধারনের অতুলনীয় দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বহু দিনের সাধনায় বহু ভাষায় জ্ঞানলাভের পরই তিনি ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের এই বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী হন।

নিম্নে আমরা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান থেকে কিছু ব্যুৎপত্তির উদাহরণ উদ্ধৃত করছি :

ক) আইয়াল (পাবনা)= চুলা। [অগ্নিশালা > আগিন হাল > আইনাল >]।
খ) অদোয়ানন্যা (চট্টগ্রাম)= অকেজো (গরু)।
[অ +ধোয়া + আন প্রযোজক ক্রিয়াবাচক প্রত্যয় + ইয়া প্রত্যয়, মূল অর্থ যাহাকে ধোয়ান হয় নাই।]

গ) আলক্‌তে (দিনাজপুর)= আস্তে।

[< আলগ < অলগ্ন + তে বিভক্তি]।

ঘ) কদ্‌দুন (চট্টগ্রাম) = কালো সূতা বিশেষ।

[< কয় তোন তুর্কী]।

ঙ) খাবোল (বাখেরগঞ্জ)= অঞ্জলি।

[সং কবল> খাবল]।

চ) গিদাল (রংপুর) = গায়ক।

[গীত+ আল প্রত্যয় > গীতাল]।

ছ) শদফ (বগুড়া) = ঝিনুক।

[মূল আরবী সদফ্‌]।

জ) আহাশ্‌ পাতাল্‌ (ঢাকা, কুমিল্লা) = হাসপাতাল

[ইং Hospital]।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু একটি ব্যুৎপত্তি নির্দেশ না করে বিকল্প-ব্যুৎপত্তিও প্রদত্ত হয়েছে। যেমন :

খ্যাশ্‌খ্যাশি (ঢাকা)= আড়াআড়ি।

[ফাং খ্বেশ্‌ > খেশ+ই, অর্থ বিকৃতি, অথবা < কচ্‌ কচি]।

এই 'খ্যাশ খ্যাশি' শব্দের সমার্থক খ্যাচা 'খ্যাচি' (সিলেট) শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে ভিন্নভাবে—' খিঁচ + আ > খিঁচা বা খ্যাচা; ব্যতিহারে শব্দদ্বিত্ব + ই প্রত্যয়।' এদুটি শব্দের ব্যুৎপত্তি অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ সর্বক্ষেত্রে স্থিরনিশ্চিত হয় না, প্রায় ক্ষেত্রেই তা অনুমান নির্ভর বা 'হাইপোথিসিস' হয়ে থাকে, সে কারণেই ব্যক্তিভেদে ব্যুৎপত্তি ভেদ হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে আমরা ব্যুৎপত্তি নিয়ে অনেক মতভেদ লক্ষ করি। প্রসঙ্গত আরেকটি ব্যুৎপত্তির উদাহরণ দেয়া যায় :

খ্যারাবা (কুমিল্লা) = খড়ের স্তুপ।

[<খড় + বা < বাই < বাটী]

এই খ্যারাবা শব্দের ব্যুৎপত্তি ভিন্নভাবেও নির্দেশ করা যায়। যেমন— [খড় > খ্যড় + আবা]। অভিধানের অন্যত্র আবা শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে স্তুপ। তবে একথা আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তির

ক্ষেত্রে মতভেদের অবকাশ থাকলেও আমরা মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দক্ষতা বা অবদানকে কোনোক্রমেই খাটো করতে পারিনা। শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবলম্বন না হলেও এই অভিধান সংকলন বা সম্পাদনার ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রজ্ঞা, মণীষা ও পদ্ধতিগত চিন্তার পরিচয় অভিধানের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে স্বরবর্ণ খণ্ডে তের পৃষ্ঠা ব্যাপী যে ভূমিকা লিখেছেন, সে সম্পর্কে কিছু না বললে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই ভূমিকাটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের শুরুতেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উল্লেখ করেন যে, 'বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তান প্রাচীন গৌড় বা বরেন্দ্র এবং বঙ্গ বা বঙ্গালা দেশ লইয়া গঠিত'। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে 'বঙ্গাল' বা 'বঙ্গ দেশ'-এর বিভিন্ন উল্লেখ উদ্ধৃত করে তিনি পূর্ব বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরেন [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৫ ক : ছ-জ]।

ভূমিকার দ্বিতীয় ভাগের বিষয় উপভাষা প্রসঙ্গ। উপভাষাতত্ত্বের গুরুত্বের উল্লেখ করে তিনি গ্রিয়ারসনের *'Linguistic Survy of India'* গ্রন্থের আলোচনা করেন।

গ্রিয়ারসন তাঁর ভাষাবিবরণীতে বাংলা ভাষার উপভাষাগুলিকে অঞ্চলভেদে যে শ্রেণিকরণ করেছেন, সে বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপভাষাসমূহকে চিহ্নিত করে এবং গ্রিয়ারসনের মতকে কিছুটা পরিবর্তন করে পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশের উপভাষাসমূহের শ্রেণিকরণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পূর্ব পাকিস্তানের তথা পূর্ব বঙ্গের উপভাষাসমূহের শ্রেণিকরণ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আগে আর কেউ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি গ্রিয়ারসনের শ্রেণিকরণের সমালোচনা করে এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। যথা—

(ক) রংপুরের ভাষাকে রাজবংশী শাখার অধীন না বলে উদীচ্য শাখারই একটি প্রশাখা বলা উচিত। কারণ,

'জ' স্থানে 'Z' ধ্বনি, 'ছ' স্থানে 'S' ধ্বনি ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, যেমন আদি 'র' লোপ, আদি স্বরে 'ব' আগম, বিভক্তিতে ক্ ও ত্ ইত্যাদি উদীচ্য শাখার লক্ষণ।

(খ) প্রাচ্য বিভাগের পূর্বকেন্দ্রিক শাখাকে প্রাচ্যশাখার অধীন না বলে পাশ্চাত্য শাখার একটি প্রশাখা (পূর্বশাখা) বলা সঙ্গত। কারণ দুই একটি ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ ছাড়া এই পূর্ব শাখা 'বহুবিষয়ে পাশ্চাত্য বিভাগের বিশিষ্ট ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন'।

(গ) ময়মনসিংহের হাজং শাখা 'জাতিগত একটি প্রশাখা' বিধায় এই প্রশাখা বর্জনীয়।

(ঘ) নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের উপভাষার মধ্যে 'প' স্থানে 'ফ' এবং প্রথম পুরুষের সর্বনামের স্ত্রী-লিঙ্গের স্বতন্ত্র রূপ ছাড়া আর কোনো সাধারণ লক্ষণ নেই। সে কারণেই তিনি নোয়াখালীর উপভাষাকে পূর্বদেশী শাখার অধীন বলে মনে করেন।

(ঙ) চাকমা জাতিগত একটি উপশাখ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে এতে চট্টগ্রামী ভাষার সাদৃশ্য বর্তমান।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতানুসারে পূর্ববঙ্গের উপভাষাসমূহ

(জেলা ভিত্তিক শ্রেণিকরণ)

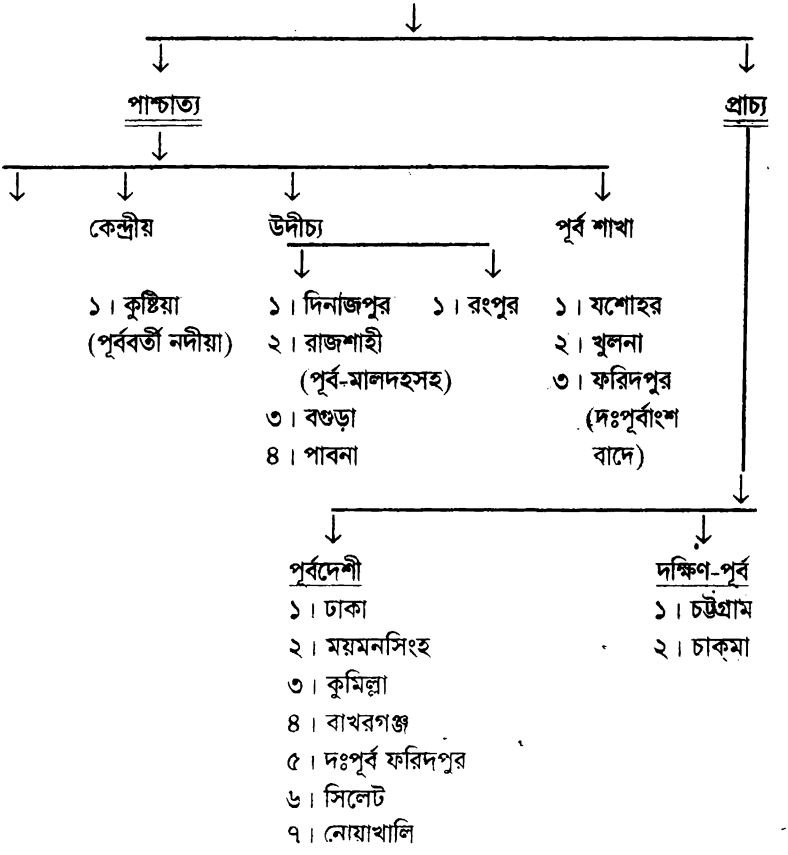

গ্রিয়ারসন তাঁর *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাধুভাষার একটি অনুচ্ছেদ ও তাঁর বিভিন্ন রূপান্তর তুলে ধরেন। সে উদাহরণ অনুসরণ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন উপভাষার রূপভেদ উদ্ধৃত করেন। লক্ষণীয় বিষয়, উচ্চারণ প্রদর্শনের জন্য এই উদাহরণে তিনি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের ধ্বনিলিপি ব্যবহার করেন। যেমন, নোয়াখালী জেলার (ছাগলনাইয়া) ভাষার নিদর্শন নিম্নরূপ :

এক্ যনের্ দুই হোলা আসিল্। সুড়ুগায় হেত্তার্ বাফেরে কৈলো, বায়াযি, আঁর ব্যগে যেগাইন হোস্‌সে হেগাইন্ আঁরে দ্যাও। হেইমতে হ্যাতার্ যা আসিল্ ব্যায়াগ্ হ্যাতার হোলার্ গরে বাগ্ কোরি দিল্।

আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের তৃতীয় ভাগে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

ভূমিকার চতুর্থ ভাগে আঞ্চলিক ভাষার শব্দসম্ভারের বৈচিত্র্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণির উদাহরণ উদ্ধৃত হয় :

(ক) প্রাচীন বা মধ্য বাংলা থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দ (যেমন, আঁচাভূঁয়া, দুরা, মুসা)।

(খ) সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে উৎপন্ন শব্দ (যেমন, শুশা< সংস্কৃত শশক, থুনি <সংস্কৃত স্থূণা)।

(গ) হিন্দী থেকে আগত শব্দ (যেমন, ছারপোকা অর্থে উলুশ্ <হিন্দি উড়ুশ, অন্‌দশা <হিন্দি অন্দরসা)

(ঘ) কৃতঋণ বিদেশী শব্দের বিকৃতি (যেমন, আর্‌মুনি <ইংরেজি হারমোনিয়াম, ওল্‌কম্ <আরবি হুল্‌কম)।

(ঙ) সাধুভাষার বিকৃত শব্দ (যেমন, হরি <শাশুড়ী, ঔন <আগুন, আড়ু < হাঁটু)।

(চ) অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ (যেমন, পিদ্‌দুম্ < সংস্কৃত প্রদীপ, জলক্ < সংস্কৃত জলৌকা)।

(ছ) বিদেশী শব্দের দেশী প্রতিশব্দ (যেমন, টিপ্‌বাতি—টর্চলাইট, যাতি-কাঁচি)।

(জ) কৃতঋণ শব্দের প্রতিশব্দ (যেমন, মৌয়া—খালু, যাংগৈই—ফুপা)।

(ঝ) সাধু ভাষায় অপ্রচলিত কৃতঋণ শব্দের নিদর্শন (যেমন, ইস্পাত অর্থে পোলাদ <ফারসি ফোলাদ, ডিম অর্থে বয়দা < আরবি বয়যঃ)।

(ঞ) আসামি ভাষার সদৃশ শব্দ (যেমন, পা অর্থে বৈর <আসামি ভরি)।

ভূমিকার পঞ্চম বা শেষভাগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশের উপভাষার অভিধান রচনার প্রথম প্রচেষ্টা এফ. ই. পার্জিটারের *ভোকাবুলারি অব পিকিউলিয়ার ভার্নাকুলার বেঙ্গলি ওয়ার্ড্স* (Vacabulary of peculiar Vernacular Bengali Words') গ্রন্থের উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি যোশেফ রাইটের *ইংলিশ ডায়ালেক্ট ডিকসনারি* (English Dialect Dictionary)-এর ন্যায় বাংলা ভাষার একটি প্রামাণ্য অভিধানের বিশেষ অভাব অনুভব করেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেন :

> বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম বাঙ্গালা এবং বিহার, আসাম ও বর্মার কোনও কোনও অঞ্চলে প্রচলিত। এই সকল স্থানের উপভাষার নমুনা সংগৃহীত হইলে, বাংলা ভাষার উপভাষার একটি সার্থক পূর্ণ-চিত্র অংকিত হইতে পারিত। তাহা কবে হইবে এবং কখনও হইবে কিনা, আমরা জানি না।

॥ তিন ॥ লৌকিক শব্দকোষ

কামিনীকুমার রায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে সংকলিত *লৌকিক শব্দকোষ* দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৭১। প্রথম খণ্ডের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের নাম পৃষ্ঠায় শিরোনামের সঙ্গে লেখা ছিল- 'বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতিমূলক অভিধান'। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার শুরুতে লেখা হয়েছে-'লৌকিক শব্দকোষ সমগ্র বাংলাদেশের (বিভাগোত্তর পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান) বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষার শব্দাবলির কোষগ্রন্থ'।

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান এবং *লৌকিক শব্দকোষ* উভয়গ্রন্থের উদ্দেশ্য মূলত এক, অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষার শব্দাবলীর কোষগ্রন্থ বা অভিধান প্রণয়ন। তবে আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দাবলি সংকলিত হয়েছে; অন্যদিকে লৌকিক শব্দকোষ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলি স্থান পেয়েছে। তাছাড়া উভয় গ্রন্থের সংকলন পদ্ধতিও ভিন্ন। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকৃতির দিক থেকে অভিধান গ্রন্থ;

কিন্তু, লৌকিক শব্দকোষে সকল শব্দ বিষয়ানুসারে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত। লৌকিক শব্দকোষে শব্দাবলি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত হলেও পাঠকের সুবিধার্থে শব্দ তালিকায় বর্ণনানুক্রমিক ধারা অনুসৃত হয়েছে। প্রকৃতিতে এ গ্রন্থটি বিবৃতিমূলক।

লৌকিক শব্দকোষ প্রণেতা কামিনীকুমার রায় ১ম খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, ১৯২৯ সালে এম. এ. পাস করার পর তাঁর অধ্যাপকবৃন্দের প্রেরণায়ই এই শব্দকোষ প্রণয়নের সূত্রপাত। পরোক্ষভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* প্রকাশিত বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহ। প্রথমে তিনি ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের শব্দ-সংগ্রহ দিয়ে কাজ শুরু করেন এবং ক্রমে তাঁর অনুসন্ধানক্ষেত্র সমগ্র বঙ্গে সম্প্রসারিত হয়।

লৌকিক শব্দকোষ প্রণেতা কামিনীকুমার রায় স্বয়ং স্ব-নির্ধারিত পদ্ধতিতে শব্দ সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁর শব্দ-সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন :

> প্রায়ই গ্রামে গ্রামে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া এক একটি বস্তু বা বিষয় সংশ্লিষ্ট শব্দ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তুগুলি সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করায় এক অঞ্চলের সহিত অপর অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা করা সহজ হইয়াছে। এক অঞ্চলের সংগ্রহ যথাযথ করিতে পারিলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অপর অঞ্চলের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া যায়। একই নামধাম বা তথ্য বার বার না লিখিয়া উহাদের পার্শ্বে শুধু আঞ্চলিক পার্থক্যগুলি লিখিলেই চলে। লৌকিক শব্দকোষের জন্য সংগ্রহ কার্য অনেক ক্ষেত্রে এই আদর্শেই পরিচালিত হইয়াছে। [কামিনীকুমার রায় ১৯৭৭ : ২৭]।

উপরে বর্ণিত শব্দ-সংগ্রহ-পদ্ধতি বিচারে অনুমান করা যায় যে, শব্দকোষ প্রণেতা প্রস্তুত কোনো শব্দতালিকা নিয়ে শব্দ-সংগ্রহে যাননি। তিনি সরেজমিনে গিয়ে শব্দ তালিকা প্রণয়ন করেন এবং পরে তিনি এই তালিকা কর্মপত্ররূপে ব্যবহার করে বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক রূপভেদ অনুসন্ধান করেন। মূলত একজন ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণে শব্দ এবং তার উচ্চারণ অনুসন্ধান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিষয় ও বস্তু, শব্দ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির সংকলন।

সে কারণেই তিনি এই শব্দকোষকে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান না বলে আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতিমূলক অভিধান বলেছেন।

শব্দ-সংগ্রহের জন্য কামিনীকুমার রায় বিশেষ কোনো স্থানে যেতে না পারলে সে স্থানের লোক খুঁজে বের করে শব্দ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি, তাঁর ভাষায় 'একেবারে কাদা মাটির মানষ' বেছে নিয়েছিলেন।

সংগ্রহকার্যে তিনি শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরই শরণাপন্ন হননি, প্রয়োজনবোধে দশ বারো বছরের বালকের সাহায্যও নিয়েছেন।

লৌকিক শব্দকোষটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সংকলক প্রত্যক্ষ এ দুটি পদ্ধতি ছাড়াও পরোক্ষ দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যেমন (১) শব্দ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত পূর্বসূরীদের শব্দ সংকলনের সাহায্য গ্রহণ (২) বাংলা ভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে আঞ্চলিক শব্দ, বাগধারা ইত্যাদির সংকলন। অলোচিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং প্রবন্ধাদির বিস্তৃত তালিকা দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে এবং প্রথম খণ্ডের ২য় সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যখন বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে তখন অধিকাংশ শব্দ-সংগ্রহকে গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ নামে অভিহিত করা হয়। কামিনীকুমার রায় অবশ্য তার ভূমিকায় 'গ্রাম্য শব্দে'র সঙ্গে বিশেষ ধরনের স্পর্শকাতরতা বিদ্যমান থাকায় তিনি তাঁর বদলে 'লৌকিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া এ গ্রন্থে লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন তথ্যাদি যে ভাবে বিবৃত হয়েছে তাতে 'লৌকিক শব্দ'টি যথোপযুক্ত বলে মনে হয়।

লৌকিক শব্দকোষ গ্রন্থে শব্দবিন্যাস প্রণালী সম্পর্কে সম্পাদক লিখেছেন 'সংগৃহীত শব্দগুলিকে এক অধ্যায়ে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বড় হরফে সাজানো' হয়েছে। বড় হরফে চিহ্নিত শব্দের সঙ্গে উক্ত শব্দের উচ্চারণভেদ ও আঞ্চলিক সমনাম প্রদত্ত হয়েছে। তাছাড়া বড় হরফে মুদ্রিত শব্দের সঙ্গে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় শব্দের বিবৃতি ও আলোচনা একত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি বর্ণানুক্রমিক সাজানো হয়েছে।

লৌকিক শব্দকোষ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এ খণ্ডের প্রথম সংস্করণে সাতটি অধ্যায় ছিল। প্রথম খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে অধ্যায় বিভাজন নিম্নরূপ :

(১) ঘরবাড়ি, (২) গৃহ-সামগ্রী, (৩) চাষ-আবাদ (৪) উদ্ভিদ (৫) জীবজন্তু, (৬) আত্মীয় কুটুম্ব, (৭) নামাবলী, (৮) বিবাহের খুঁটিনাটি, (৯) লোকউৎসব ও সংস্কার (১০) বাংলা ক্রিয়াপদ।

দ্বিতীয় খণ্ডে নয়টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে :

(১) মনুষ্য-দেহ, (২) খাদ্য-পানীয়, (৩) বসন-ভূষণ, (৪) ব্যবসা ও পেশা, (৫) যানবাহন, (৬) বিশেষক শব্দ, (৭) নৈসর্গিক, (৮) বিবিধ শব্দ (৯) দেবদেবীর নাম।

লৌকিক শব্দকোষের সূচিপত্রে প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়-পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। পরিচিতিটি অনেকটা বর্ণনামূলক। যেমন, গৃহ-সামগ্রী অধ্যায়ের পরিচিতিটি নিম্নরূপ :

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ বাঙালীর ঘরে যে সকল গৃহ সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, যেমন, হাঁড়ি কড়া থালাবাটি ধামাকুলা কাঠা কুনকে কলস গামলা কাস্তে কাটারি ইত্যাদির নাম ও বিশদ বিবরণ ঃ উহাদের গড়ন পিটন নির্মাণশৈলী ও নির্মাণ উপকরণ ঃ নানা আকারের ঘট ঃ ঢেঁকি সংক্রান্ত বিভিন্ন শব্দঃ হুকা কল্‌কে ঃ কাঁথা ও শিকা-শিল্পঃ বাংলার লক্ষ্মীশরাঃ নানারূপ লোকশ্রুতি ও সংস্কার ইত্যাদি।

লৌকিক-শব্দকোষ গ্রন্থের ভূমিকায় শব্দতালিকায় অনুসৃত বানান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সম্পাদক কামিনীকুমার রায় এ-গ্রন্থে "সাধারণভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' ও রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকা' অনুসরণ" করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি· কিন্তু তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দগুলির বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লিখতে গিয়ে তিনি, সম্ভবত দিশেহারা হয়ে, ক্ষ্যান্ত হয়েছেন। কারণস্বরূপ তিনি লিখেছেন :

শব্দের উচ্চারণে শুধু রাঢ়, পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ এইরূপ এক অঞ্চলের সহিত অপর অঞ্চলেরই পার্থক্য আছে, তাহা নহে। এই পার্থক্য একই অঞ্চলেরও জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে, এমন কি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্যক পরিস্ফুট।

এ উক্তির সমর্থনে তিনি ভূমিকায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন এবং পরিশিষ্টে তিনি বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন, 'উচ্চারণ অনুসারে বানান পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন করিবে' ('বাগর্থ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি)।

লৌকিক শব্দকোষে এই সাধু বানান অনুসৃত হওয়ায় লৌকিক শব্দাবলি আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারেনি। সংকলক 'একবারে কাদামাটির মানুষে'র কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ করলেও সে শব্দাবলিতে মাটির গন্ধ নেই। এ শব্দকোষের বানানে এ-কারের বক্র উচ্চারণ নেই, আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণের অ-কার, আ-কার ভেদ নেই, শ-স বা জ-য ভেদ নেই, চ-বর্গীয় ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ নেই, শব্দের পদ মধ্যবর্তী স্বরান্ত হসন্ত ভেদ-নেই। যার ফলে প্রতিটি শব্দই আঞ্চলিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বর্জিত।

লৌকিক শব্দকোষে, আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের ন্যায়, সর্বত্র না হলেও আঞ্চলিক শব্দের প্রচলন-স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। কামিনীকুমার রায় মনে করেন প্রচলন স্থানের উল্লেখ অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। এ সম্পর্কে সংকলকের ভূমিকা থেকে আমরা অংশবিশেষ উল্লেখ করছি :

> যে শব্দটি নদীয়ার বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা যে ঐ জেলার সর্বত্রই সকলের মুখে শুনা যায় এবং তৎসংলগ্ন চব্বিশপরগণা, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা বা অন্য কোথাও উহার প্রচলন নাই বা একই অর্থে আর কোনও শব্দ এসব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়না, এইরূপ মনে করা হইলে ভুল করা হইবে। বাংলার কোন অঞ্চল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত নহে, সর্বদাই এক অঞ্চলের লোকের সহিত অপর অঞ্চলের লোকের নানাসূত্রে যোগাযোগ ঘটিতেছে। ফলে এক অঞ্চলের ভাষার প্রভাব, উহার শব্দ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি অপর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তদুপরি উচ্চারণে এবং শব্দের ব্যবহারে একই জেলার মধ্যেও বিভিন্নতার অন্ত নাই। এই বিভিন্নতার মুখে অঞ্চল বা জেলাসঙ্কেত দ্বারা মাত্র এই আভাসই দেওয়া হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট শব্দটি কোন্ অঞ্চলের লোকের মুখের ভাষা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে [কামিনীকুমার রায় ১৯৭৭: ৪০]।

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হলেও আমরা উল্লেখ করেছি এ কারণে যে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাবে কি ভাবে একটি অঞ্চলের ভাষার রূপান্তর ঘটে এবং একই জেলার অঞ্চল ভেদে যে ভাষাভেদ ঘটে থাকে সে সম্পর্কে সঙ্কলক সুচিন্তিত মন্তব্য তুলে ধরেছেন। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* ভূমিকায় এ-জাতীয় কোনো মন্তব্য না থাকলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ মন্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন। এ কথাও আমরা বলতে পারি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে বিভিন্ন শব্দের পাশে জেলার যে নাম রয়েছে তা প্রচলন-স্থান উল্লেখ না করে কোন অঞ্চলের শব্দ সংগ্রাহকের কাছ থেকে শব্দটি সংগৃহীত হয়েছে তা নির্দেশ করে।

আমরা উভয় অভিধানে আঞ্চলিক শব্দ এবং সংগ্রহ-স্থলের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করে থাকব। উদাহরণস্বরূপ *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* এবং লৌকিক শব্দকোষ থেকে পেঁপে শব্দের বিভিন্ন রূপভেদ এখানে তুলে ধরছি।

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	*লৌকিক শব্দকোষ*
কম্‌পা — কুমিল্লা	পিয়া — ময়মনসিংহ
কমফা — ঢাকা	পাঁপে — "

কয়ফল — সিলেট, ময়মনসিংহ
পাপিতা — সিলেট
পাব্‌দা — ময়মনসিংহ
পাপুয়া — ঢাকা
পাইঁপা — রংপুর
পাফিয়া — "
পিপা — "
পিপুর — রাজশাহী
পাউপ্যা — কুমিল্লা
পাওপ্‌পা — "
পাপপা — "
মধুফল — "
পাইয়া — নোয়াখালী
পাউপপা — "
পোম্‌বা — বাখরগঞ্জ
পাইবা — "
পাউপ্যা — ঢাকা, টাঙ্গাইল
পাউপা — " "
পাপুয়া — " "
পেঁপে — মুর্শিদাবাদ
পিঁপিয়া — "
পিঁফা — পাবনা
পাপিতা — মালদহ, দিনাজপুর
পাপিজ — রাজশাহী
পম্ফা — ফরিদপুর
পোম্বা — বরিশাল
পোইয়া — চট্টগ্রাম
ফোইয়া — "
ফেপো — খুলনা
হাউপ্যা — নোয়াখালী
কম্পা — ঢাকা, ত্রিপুরা
মধুফল — ত্রিপুরা
হাবুল — "
কয়ফল — শ্রীহট্ট
হাইয়া — "
গাছ তরমুজ — বগুড়া

এখানে এক অভিধানে 'পাপিতা' সিলেট ও ময়মনসিংহের আঞ্চলিক শব্দ এবং অন্য শব্দকোষে তা মালদহ ও দিনাজপুরের শব্দ। 'পাইপ্যা' এক স্থলে কুমিল্লার শব্দ, অন্যত্র তা ঢাকা ও টাঙ্গাইলের শব্দ। এছাড়া একই অঞ্চলে একাধিক সমনামও পাওয়া যায় (যেমন রংপুরে পাইপা, পাফিয়া, পিপা অথবা সিলেটে কয়ফল, হাইয়া ইত্যাদি)। আরো লক্ষ করা যায়, পেঁপে শব্দের প্রতিশব্দ বা উচ্চারণভেদের সংখ্যা *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* মাত্র ১৭টি, সে ক্ষেত্রে *লৌকিক শব্দকোষে* এর সংখ্যা ১৩টি।

পদ্ধতিগত কারণে অথবা বিষয় ও বস্তু অনুসরণের ফলে *লৌকিক শব্দকোষে* প্রায় সর্বত্রই সমনাম ও উচ্চারণ ভেদে এরূপ সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যাবে। যেমন, গৃহ সামগ্রী অধ্যায়ে 'ঢেঁকির বিভিন্ন অংশ' শীর্ষক উপবিভাগে ঢেঁকির ৮ টি অংশের নাম এবং প্রতিটি অংশের বিভিন্ন প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে :

(ক) মুষল — আগশালাই, ওঁচা, ওছা, চুরুন, চুরুম, ছিয়া, ঢুসলি/মুসুণ্ডা, ছে/মুণ্ডর, মউলা/মোল, মনই, মনাই/মুষাল, মুকইর, মুড়শালাই, মোনা, মোহনা।

(খ) শামা — শামা/ছামা, শামি/হামি, গুলা/গুলই/গুলে/গুলো, বেড়ুয়া।

(গ) গড় — লোট/নোট, পয়ল, পারন, গাইল।

(ঘ) আঁকশলি— আঁকশলাই, তশলা, আঁকশোলোয়া/তশলি, আড়শালাই / তশলি, আড়শলি, আড়মলে, আঁরাল, তশিল, তড়শাল, সাওকা / সাওকাবাড়ি, নাচুনি, নাচনাকাঠি, কোমরিয়াকাঠি।

(ঙ) পুয়া/পোয়া— কাতলা, কিলা, কেতরা, পই, পাবা, ঢেঁকির খুঁটি।

(চ) পাছুণ্ডা — পাছা, পিছাই, ঢেঁকির লেজ।

(ছ) ঢিপি/ঢিবি, পৈঠা, পোঠে।

(জ) আড়, ঘাসনা/গায়না/বগুলা।

আমরা এ-গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে এরূপ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অংশের বিস্তৃত তালিকা লক্ষ করে থাকি। রবীউদ্দিন আহমেদ্-এর *গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহে* (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩, ১৩৩৪) আমরা গরুর গাড়ির যে ২৩টি অংশের নাম পেয়েছিলাম অনুরূপ ২৩টি অংশের নাম ও তার প্রতিশব্দভেদ *লৌকিক শব্দকোষেও* লক্ষ করে থাকি। উদ্ভিদ অধ্যায়ে ধানের বিভিন্ন নামের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে প্রায় ৩৫০টি নাম পাওয়া যায়। *লৌকিক শব্দকোষে* খাদ্য দ্রব্য, বসন-ভূষণ, অলংকারাদি ইত্যাদির তালিকাও বেশ দীর্ঘ।

লৌকিক শব্দকোষের অধ্যায় পরিকল্পনায় সাধারণভাবে নামবাচক শব্দ এবং তার নামভেদ বা উচ্চারণভেদই প্রদানের কথা, সেখানে অর্থভেদ উল্লেখ করার অবকাশ খুবই কম। সঙ্কলক কামিনীকুমার রায় অবশ্য কোনো কোনো শব্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থভেদও উল্লেখ করেছেন। যেমন, ঘরবাড়ি অধ্যায়ে আল্ শব্দের তিনটি অর্থ দেয়া হয়েছে :

আল— (ক) পাড় বসাইবার জন্য ঘরের খুঁটি বা খাম্বার মাথায় যে অর্ধ চন্দ্রাকার খাঁজ কাটা হয়।

(খ) ক্ষেত্রের আল।

(গ) কাঠের আল (এক খণ্ড কাঠ আর এক খন্ড কাঠের সংগে জুড়িবার সময় যে খাঁজ কাটা হয়)।

লৌকিক শব্দকোষে বিভিন্ন শব্দের শব্দার্থ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যামূলক বা বর্ণনামূলক। যেমন, আধঘরা শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে নিম্নরূপ :

> আধঘরা- [< অর্ধগৃহ]- এককালে কুমিল্লা জেলার (বাংলাদেশ) কোথাও কোথাও শয়নগৃহের অর্ধাংশ আবরু বেড়া দিয়ে বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইত। হয়ত ইহা হইতেই তদঞ্চলে বৈঠকখানাকে 'আধঘরা' বলিতেও শুনা যায়।

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, এ-শব্দকোষ প্রণয়নের একটি উদ্দেশ্য বাংলার লোক সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের সংকলন। সম্পাদক কামিনীকুমার রায় এ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন তথ্য ও শব্দাদি সংগ্রহ করেছেন। তার পরিচয় আমরা 'বিবাহের খুঁটিনাটি' এবং 'লোক উৎসব ও সংস্কার' শীর্ষক অধ্যায় দুটিতে বিশেষভাবে লক্ষ করি। এছাড়াও সম্পাদক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির নানাদিক ধরা পড়ে এমন বিশিষ্ট কিছু শব্দ সম্পর্কেও উভয় খণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন শব্দ প্রসঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন :

ভাজাবড়া — লোভনীয় বটে, কিন্তু বিবাহের প্রারম্ভিক কথাবার্তায় পাত্র, পাত্রপক্ষ উহার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হয়। কারণ উহার সঙ্গে জড়াইয়া আছে মেয়েলী সংস্কার, ভাজা বড়া খাইতে দিলে শ্বশুর বাড়িতে মেয়েকে জীবনভর সকলের উৎপীড়নে ভাজা ভাজা হইতে হয়।

গস্ত — সেকালের চেলী-পড়া পাল্‌কি চড়া বরবধূর শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণের মধুর রূপটি ফুটাইয়া তোলে।

মুঠি তোলা - কি সুন্দর ছিল এই প্রথা। ধনী গরীব নাই, গৃহিণী মাত্রই রান্নার পূর্বে এক মুষ্টি চাল একটি হাঁড়িতে রাখিয়া দিতেন, সঞ্চয় ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিত গ্রামে, গ্রামে, ব্যয় হইত তাহা গ্রামের কাজে।

'বিবাহের খুঁটিনাটি' অধ্যায়ে মুসলমান সমাজে প্রচলিত কিছু শব্দ স্থান পেয়েছে। যেমন, কাজী, কাবিন, উকীল, তালাক, তেলৈ, দুল্‌হা, দুল্‌হিন, দামান্, দেন-মোহর, নওশাহ্ ইত্যাদি।

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, কামিনীকুমার রায় ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণে শব্দ সংগ্রহ করেন নি। এবং এ কারণেই বিভিন্ন লৌকিক শব্দের উচ্চারণ তুলে ধরার জন্য কোনো ধ্বনিলিপি ব্যবহার করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি কোনো কোনো স্থলে তৃতীয় বন্ধনিতে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করলেও সর্বত্র ব্যুৎপত্তি নির্ধারণে তৎপর হন নি।

লৌকিক শব্দকোষ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান নয়। কিন্তু, এটি লোকসংস্কৃতির অভিধান। একটি জাতির সংস্কৃতির পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন উপাদান এতে সংগৃহীত হবে এবং এ উদ্দেশ্যে এ-গ্রন্থকার বিষয় অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায় বিন্যস্ত করেছেন, বর্ণানুক্রমিক ধারা অনুসরণ করে নয়। তিনি ভূমিকায় নিজেই বলেছেন :

> শব্দগুলিকে বিষয় অনুসারে ভাগ ভাগ করিয়া উপস্থিত করার ফলে এক একটি বিষয় সম্পর্কে সমস্ত বাঙালীর চেতনা, ধ্যান-ধারণা, সংস্কার এক জায়গায় আসিয়া জড়ো হইয়াছে।

কামিনী কুমার রায় সে উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা।

॥ চার ॥ উপসংহার

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* ও কামিনী কুমার রায় সম্পাদিত *লৌকিক শব্দকোষ* গ্রন্থ দুটির উদ্দেশ্য, সংকলন-পদ্ধতি এবং এর প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়েছে। আমরা নিম্নে তা একে একে বিবৃত করছি।

১। আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংকলন উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলেও একটি অভিধান এবং অপরটি শব্দকোষ। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* শব্দের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস থাকায় শব্দ সন্ধানে কোনো অসুবিধা হয় না। *লৌকিক শব্দকোষে*, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে নির্বাচিত শব্দ-সূচি থাকলেও, বিশেষ কোনো শব্দের সন্ধানে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় দেখতে হয়। তবে, বিষয়-ভেদে শব্দ বিন্যাসের ফলে *লৌকিক শব্দকোষে* সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যায়।

২। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* শব্দ সংগ্রহ-পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এ-অভিধানের শব্দ-সংগ্রহ শব্দ সংগ্রাহকদের স্বতঃপ্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের পছন্দমত যে-শব্দ পাঠিয়েছেন, শুধু সে-শব্দগুলিই অভিধানে সংকলিত হয়েছে। সে কারণেই যে কোনো পাঠকই তাঁর নিজ অঞ্চলে ব্যবহৃত কোনো বিশেষ শব্দ এ-অভিধানে খুঁজে পাবেন না। *লৌকিক শব্দকোষেও* অনেক শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, সে শব্দকোষেও শব্দ সংগ্রহ সংগ্রাহকদের উপর নির্ভলশীল না হয়ে সংকলকের অর্থাৎ কামিনীকুমার রায়ের একক সামর্থ্য, শ্রম এবং তাঁর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভরশীল ছিল।

৩। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* সংগৃহীত শব্দ বাছাই বা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও অভিধানের শব্দ সংকলন পরিপূর্ণ করার কোনো চেষ্টা লক্ষ করা যায় না। পক্ষান্তরে, *লৌকিক শব্দকোষে* প্রত্যক্ষ শব্দ সংগ্রহ ছাড়াও পরোক্ষ উৎস অর্থাৎ পূর্ববর্তী বিভিন্ন শব্দ সংগ্রহের সাহায্যে শব্দকোষটি যথাসাধ্য পরিপূর্ণ করার প্রয়াস বর্তমান। সে কারণেই, *লৌকিক শব্দকোষে* বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দের সমনামের সংখ্যা অনেক বেশি। এই সমনাম বা প্রতিশব্দের সংখ্যাধিক্য একটি কৃতিত্বের বিষয় বিবেচনা করে, সংকলক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এই সংখ্যাধিক্যের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কামিনীকুমার রায় 'ঝাঁটা' শব্দের ২৩টি প্রতিশব্দের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* সিলেট জেলা থেকে 'ঝাঁটা' শব্দের যে সুভাষণ-শব্দ সংগৃহীত হয়েছে, তা *লৌকিক শব্দকোষে* নেই। শব্দটি হচ্ছে 'গর্ শোহাগী' (ঘর সোহাগী >)।

৪। সংকলকের অভিজ্ঞতালব্ধ নয় এমন অনেক শব্দই *লৌকিক শব্দকোষে* নেই। কিন্তু, অন্যদিকে *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* জন্য আঞ্চলিক শব্দপ্রেরক নিজেই আপন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে যে-শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, তাতে বেশ কিছু অসাধারণ (বা Peculiar) শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, হ্যালহেডের মুনশীর বাংলা-ফারসী অভিধানে এমন কিছু বিশিষ্ট শব্দ ছিল, যা আঞ্চলিক ভাষার অভিধানেও পাওয়া যায়। যেমন :

বাংলা-ফার্সী অভিধান	*আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*
জুলি = নহর বা নদী।	ছুলি = ছোট ডোরা বা গর্ত।
ঠাসকী = ফেরেব বা প্রতারণা।	ঠাস্‌কী = ফাঁকি।
টাম টুম = আসবাব।	টামিটুমি = গৃহস্থালীর ছোট খাট দ্রব্যাদি।
এড়য়া = হুক্কার নীচে থাকে যে টুক্‌রা।	এরুয়া = হুক্কা রাখার মেটে পাত্র বিশেষ।
চুকৈর-গুচ্ছ	চুকৈর = সুপারী, নারিকেল, খেজুর ইত্যাদির থোপা গুচ্ছ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* জন্য অধিকাংশ শব্দ-সংগ্রাহক বিভিন্ন জেলার শব্দ ঢাকা থেকেই প্রেরণ করেছেন। সে কারণে এসব শব্দের বিশ্বস্ততা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু লক্ষ করা যায়, হ্যালহেডের মুনশী কলকাতায় বসেই নোয়াখালী অঞ্চলের দুহাজার আঞ্চলিক শব্দ সংকলন করেন।

৫। গ্রিয়ারসনের *বিহার পেজেন্ট লাইফ* গ্রন্থের শব্দ তালিকাকে আদর্শ করে রবীউদ্দিন আহমদ বিভিন্ন বস্তুর বা তার বিভিন্ন অংশের নাম সংগ্রহ করেছেন। কামিনীকুমার রায় মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদ-এর শব্দ সংগ্রহ দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তার পরিচয় লাঙ্গল বা গরুর গাড়ির বিভিন্ন অংশের নাম-তালিকায় পরিলক্ষিত হয়।

৬। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের জন্য শব্দ-সংগ্রাহকগণ যে শব্দাবলি সংগ্রহ করেন, তা সর্বক্ষেত্রে যথাযথ আঞ্চলিক উচ্চারণ প্রকাশ করেনি। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য বিচার করে উচ্চারণানুযায়ী যে বানান পুনর্গঠিত হয়েছে তা ভাষাতাত্ত্বিকদের বিচারে সম্পূর্ণ গ্রহণ যোগ্য না হলেও এই উচ্চারণানুগ বানান নির্ধারিত না হলে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ-সংগ্রহের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। এ-ক্ষেত্রে কামিনীকুমার রায় ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ তিনি আঞ্চলিক বা লৌকিক শব্দের শুদ্ধ বা সাধু বানান সংরক্ষণের পক্ষপাতি। সেকারণেই কামিনীকুমার রায় 'কাদা মাখা সাধারণ মানুষের' কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ করলেও অনেক ক্ষেত্রে তাতে মাটির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৭। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* একজন ভাষাতাত্ত্বিক বা ভাষা তত্ত্বানুরাগী পাঠক কৌতূহলোদ্দীপক অনেক তথ্য খুঁজে পাবেন। *লৌকিক শব্দকোষে* তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহলের নিবৃত্তি না হলেও একজন সমাজতত্ত্ববিদ, লোক-জীবন, লোক-সমাজ ও লৌকিক সংস্কৃতির অনেক তথ্য ও সংবাদ এ গ্রন্থে খুঁজে পাবেন। সে-অর্থে এই উভয় গ্রন্থই একটি অন্যটির পরিপূরক।

৮। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* যে-কোনো শব্দেরই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত অর্থভেদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। *লৌকিক শব্দকোষের* গ্রন্থপরিকল্পনায় অর্থভেদ প্রদানের সুযোগ ছিল কম। তবে, উভয় গ্রন্থ এক সঙ্গে পাঠ করলে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে। যেমন, *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* 'আল্' শব্দের ১২টি অর্থভেদ থাকলেও *লৌকিক শব্দকোষে* প্রাপ্ত একটি বিশেষ শব্দার্থ ('পাড় বসাইবার জন্য ঘরের খুঁটি বা খাম্বার মাথায় যে অর্ধচন্দ্রাকার খাঁজ কাটা হয়') উক্ত অভিধানে নেই।

৯। কামিনীকুমার সম্পাদিত *লৌকিক শব্দকোষ* ১৯৬৮ সনে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তার পূর্বেই *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* প্রথম খণ্ড ১৯৬৫ সনে আত্মপ্রকাশ লাভ

করে। শব্দকোষের এই সংস্করণে 'পরিচয়' শীর্ষক ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*-প্রথম খণ্ড প্রকাশে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* প্রতিটি শব্দের সঙ্গে যে প্রয়োগ-উদাহরণ দেয়া হয়, তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যময়। তিনি বলেন :

> এই কথ্য ভাষার অভিধানের একটি বিশেষ গুণ এই যে, যে-অঞ্চলের ভাষার শব্দ তাঁহারা ধরিয়া দিয়াছেন, সেই অঞ্চলের লোকের মুখে সেই শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে শুদ্ধ একটি কথ্যভাষার শব্দের জীবন্ত স্বরূপটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০। *লৌকিক শব্দকোষে* কামিনীকুমার রায় লোক-জীবন ও লোক সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে যে-সব শব্দ সাহিত্যে বা অভিধানে অর্ন্তভুক্ত হলেও গ্রামাঞ্চলে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেসব শব্দ এই গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। কিন্তু, *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* সাহিত্যে ব্যবহৃত অথবা অভিধানে প্রাপ্ত শব্দাবলি আঞ্চলিক শব্দ হিসাবে গণ্য করা হয়নি।

শব্দ-সংগ্রহ ও সংকলন-পদ্ধতির ত্রুটিতে এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* এবং *লৌকিক শব্দকোষের* যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে, সকলেই তা স্বীকার করেন। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানকে* পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে এর পরিপূরক আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহের একটি প্রস্তাব *বাংলা একাডেমী পত্রিকার* মাঘ-চৈত্র-১৩৬৮ সংখ্যায় ('আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ') প্রকাশিত হয়। পরীক্ষামূলক কাজ হিসাবে আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহের জন্য প্রণীত একটি 'শব্দ তালিকা' বা 'Work-list' মুদ্রিত হয়। কৌতূহলী পাঠকের জন্য সে শব্দ তালিকার বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১।	আত্মীয় - স্বজন	-	৭৮।
২।	সম্বোধন	-	১৯।
৩।	শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	-	৯৭।
৪।	সামাজিক রীতিনীতি	-	৭৫।
৫।	পোশাক পরিচ্ছদ	-	২৩।
৬।	গৃহসামগ্রী ও গৃহকার্য	-	৩১৫।
৭।	কৃষি কার্য	-	২৯৪।
৮।	জীবিকা সংক্রান্ত	-	১৩২।

৯।	জমি সংক্রান্ত	-	৩৮।
১০।	বৃক্ষ, ফল ও শাকসব্জী	-	৬৮।
১১।	পশুপক্ষী	-	১৭০।
১২।	প্রকৃতি ও আবহাওয়া	-	১৩৮।
১৩।	সময়	-	৮৩।
১৪।	বিশেষণ	-	১৩৭।
১৫।	বিশিষ্ট ক্রিয়া	-	৪৪।
১৬।	ব্যাকরণ (সর্বনাম, ক্রিয়া, বিভক্তি, অব্যয় ইত্যাদি)	-	৩৪৫।

এই শব্দ তালিকা অনুযায়ী কয়েকটি মহকুমা থেকে আঞ্চলিক শব্দও সংগৃহীত হয়েছিল। এ-কাজে বাংলা একাডেমীর সংকলন বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন কারণে এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তবে, ভবিষ্যতে *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*-এর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশের জন্য এজাতীয় শব্দ তালিকা অনুসরণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হওয়া একান্ত কাম্য।

টীকা

১। পরবর্তীকালে, এ-দুটি গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় :

ক) সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*, (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'প্রবেশক' ও 'টীকা'সহ), রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৪৬।

খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত ও অনূদিত *পাদ্রি মানোএল দা আস্‌সুম্পসাম রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩১। বাংলা সংস্করণটি মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। মূল গ্রন্থে অভিধান অংশে প্রায় ৬,৫৫০টি বাংলা শব্দ ছিল, বাংলা সংস্করণে রয়েছে প্রায় ২,৫০০ টি বাংলা শব্দ।

২। হ্যালহেড সংগৃহীত মোট ১৩৩টি পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে (বর্তমানে 'ব্রিটিশ লাইব্রেরি' নামে অভিহিত) সংরক্ষিত আছে। এ সংগ্রহে চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, মহাভারত প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি ছাড়াও বাংলা-ভাষা-চর্চা সংক্রান্ত কিছু পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। ১০০ পৃষ্ঠার বাংলা-ফার্সি শব্দকোষের পাণ্ডুলিপিতে (নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬১/এ) দু হাজার বাংলা শব্দ ও তার ফার্সি অর্থ সঙ্কলিত হয়েছে।

৩। বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় সংরক্ষিত এই পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা ১৭৬২। পত্র সংখ্যা ৯৮, খণ্ডিত। এই বাঙ্গালা অভিধানের সংকলয়িতার নাম অজ্ঞাত। পঞ্চানন মণ্ডল রচিত *পুঁথি পরিচয়* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (পৃষ্ঠা-৩৮৮-৮৯) পুঁথিটির বর্ণনা পাওয়া যায়। *পুঁথি-পরিচয়* গ্রন্থে এ-অভিধানের কয়েকটি পৃষ্ঠার শব্দ ও শব্দার্থ উৎকলিত হয়েছে। পঞ্চানন মণ্ডলের মতে খণ্ডিত পুঁথিটি উনিশ শতকের প্রথম দশকে লিপিকৃত।

৪। ডাঃ লিডেনের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর সংগৃহীত ২৫০০টি পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাদি ১৬টি কাঠের বাক্সে ভরে কলকাতা থেকে লন্ডন প্রেরিত হয়। লিডেনের পিতা ১৮২৪ সালে ৫০০ পাউন্ডের বিনিময়ে এই মূল্যবান সংগ্রহটি তদানীন্তন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (বর্তমান নাম বৃটিশ লাইব্রেরি) প্রদান করেন।

৫। *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* শীর্ষক গ্রন্থাবলি ১৯টি খণ্ডে (উপখণ্ড সহ) সমাপ্ত। বিভিন্ন খণ্ডের বিষয়সূচি নিম্নরূপ—খণ্ড ১ ঃ অংশ ১-ভূমিকা/খণ্ড ১ঃ অংশ ২- ভারতীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক শব্দকোষ/খণ্ড ২ ঃ-মন-খমের ও তাই ভাষাগোষ্ঠী/খণ্ড ৩ ঃ অংশ ১-হিমালয় উপভাষা-উত্তর আসাম শাখা/খণ্ড ৩ ঃ অংশ ২-তিব্বতী বর্মী ভাষাসমূহের বোডোনাগা ও কোচিন শাখা/খণ্ড ৩ ঃ অংশ ৩-তিব্বতী-বর্মী ভাষাসমূহের কুকি, চিন ও বর্মী শাখা/খণ্ড ৪-মুণ্ডা ও দ্রাবিড়ীয় ভাষাসমূহ/খণ্ড ৫ ঃ অংশ ১-বাংলা ও আসামি/খণ্ড ৫ ঃ অংশ ২-বিহারী ও উড়িয়া/খণ্ড ৬-পূর্বী হিন্দী ভাষা/খণ্ড ৭-মারাঠী ভাষা/খণ্ড ৮ঃ অংশ ১-সিন্ধী ও লাহন্দা/খণ্ড ৮ ঃ অংশ ২-দার্দিক শাখা/খণ্ড ৯ ঃ অংশ ১-পশ্চিম হিন্দী ও পাঞ্জাবী/খণ্ড ৯ ঃ অংশ ২-রাজস্থানী ও গুজরাটী/খণ্ড ৯ ঃ অংশ ৩-ভিল ভাষাসমূহ / খণ্ড ৯ ঃ অংশ ৪-পাহাড়ী ভাষাসমূহ/খণ্ড ১০-ইরানীয় শাখা / খণ্ড ১১-জিপসী ভাষাসমূহ।

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের জন্য শব্দ সমিতি নামে একটি সমিতি ১৩১৪ সালে গঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ছিলেন হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্র নাথের নাম উল্লেখযোগ্য। এই শব্দ সমিতির ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

কামিনী কুমার রায় ১৯৭৭ — *লৌকিক শব্দকোষ*। ১ম খণ্ড : ২য় সংস্করণ। কলকাতা।

১৯৭১ — *লৌকিক শব্দকোষ*। ২য় খণ্ড।

পঞ্চানন মণ্ডল
১৯৮০
পুঁথি পরিচয়। ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী।

পবিত্র সরকার
১৯৮১
হলহেড : জীবনকথা। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। কলকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৫৬
পরিষৎ-পরিচয়। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
১৯৪৯
ভাষা ও সাহিত্য। ঢাকা।

১৯৬৫-ক
পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। স্বরবর্ণ অংশ। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

১৯৬৫-খ
পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। ব্যঞ্জন বর্ণ অংশ (ক, চ ও ট বর্গ)। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

১৯৬৮
পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ (ত থেকে অবশিষ্ট বর্ণ)। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
১৯৮৭
অভিধান। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
১৯৭০
বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্যামসুজ্জামান খান
আজহার ইসলাম
সেলিনা হোসেন (সম্পা)
১৯৮৫
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সজনীকান্ত দাস (সম্পা)
১৩৪৬
কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-মানোএল-দাঁ-আসুম্পসাম্।
কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ।

১৩৫৩
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (গদ্যের প্রথম যুগ)। কলকাতা।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন ১৯৩১ — *পাদ্রি মানোএল্-দা-আসসুম্পসাম্ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পা) ১৯৮৫ — বাঙলা ভাষা। ২য় খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

(নামহীন) ১৩৬৮ — আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ-*বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ১৩৮৩ — হ্যালহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুনশী। *ভাষা-সাহিত্য পত্র*, ৪র্থ বর্ষ।

হাবীবুর রশীদ ১৩৭০ — বাংলা অভিধানের কথা, *বাংলা একাডেমী-পত্রিকা;* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

ইংরেজি

Chatterji. S. K. 1926 — The Origin and Development of the Bengali Languege. 2 Vols. Calcutta.

Grierson. G. A. 1927 — Linguistic Survey of India. Volume. 1. Calcutta,

1903 — Linguistic Survey of India. Volume V. Part 1. Calcutta.

Khondkar. Abdur Rahim. 1976 — The Portuguese contribution to Bengali prose. Grammar & Lexicography. Bangla Academy : Dhaka.

Qayyum. M. A. 1983 — A Critical Study of The Early Bengali Grammars. Dhaka.

Ranking. G. S. A. 1925 — History of the college of Fart William Bengal Past and Present. Vol. XXIX.

Roebuck. T. 1819 — Annals of the College of Fort William, Calcutta.

পাণ্ডুলিপি

ব্রিটিশ লাইব্রেরি পাণ্ডুলিপি

Additional 26594 — *বাংলা শব্দকোষ-কুকি প্রতিশব্দসহ*। পত্র ৮১-৮৯।

Additional 26595 — *বাংলা শব্দকোষ খাসিয়া প্রতিশব্দসহ*। পত্র ৬০-৬৭।

Additional 26595 — *বাংলা শব্দকোষ-সংস্কৃত ও ত্রিপুরা প্রতিশব্দ সহ*। পত্র ১২৮-১৪৬।

Additional 26595 — *সংস্কৃত বাংলা উড়িয়া শব্দকোষ*। পত্র ১৪৭-১৬০।

Additional 5661 A — *বাংলা ফারসী শব্দকোষ*। পত্র ১-৫০।